2128

সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ববিচার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৫।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা।

পঞ্চম অধ্যায়—সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্।

উৎসর্গ-পত্র।

এই পুস্তক

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে

উৎসর্গ করা হইল।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভূমিকা।

বিগত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে এক নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই পুনরুত্থান-আন্দোলনের ফলে, আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণের শাস্ত্রের প্রতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে আজকাল বেদ-উপনিষৎ, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে মহামূল্য সারতত্ত্ব সকলের সানুরাগ আবৃত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অতি অল্প লোকেই সেই সকল শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি অল্পলোকেই শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রচলিত সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে অধিকাংশ লোকের মনে গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে। পরন্তু বিগত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ যে নিরাকারবাদের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বরোপাসনাসম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসার পথ আরও দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের তর্ক-কুজ্ঝটিকা-আচ্ছন্ন হইয়া অনেকের চক্ষু সত্যের জ্যোতি দর্শন করিতে পারিতেছেন না। সত্যনিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেও অধিকাংশ লোকের মনে যে প্রবল ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য

তাঁহারা সমুৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃততথ্যনিরূপণ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিবে আশায় এই সামান্য পুস্তকখানি বিনীতভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতিবিশদরূপে ও প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" প্রথম ভাগ ও "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" নামক পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এজন্য এই দুই খণ্ড পুস্তক অবলম্বনে নিরাকারবাদিগণের আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যে সকল পাঠকগণের উক্ত পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই, তাঁহাদের সুবিধার জন্য নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি, যতদূর সম্ভব, বহুলরূপে তাঁহার নিজের কথায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

একটী কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি। এই পুস্তকে কেবল দেশীয় ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতের আলোচনা করা হয় নাই।

মদীয়বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, এই পুস্তকের কপি প্রস্তুত ও অধিকাংশ প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মদীয় অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও এ বিষয়ে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকে যে সকল সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করা হই-

য়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে যত্নশীল হইব।

এই সামান্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি একটী হিন্দু-সন্তানেরও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি জন্মে, তবে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

বাউষখালী,
জেলা ফরিদপুর।
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়—নিরাকারবাদের উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রহ্মজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়—অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তি।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার।

প্রথম অধ্যায়।

নিরাকারবাদের উৎপত্তি।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দুই প্রণালীর ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত আছে। প্রথম প্রণালী নির্গুণোপাসনা; দ্বিতীয় প্রণালী সগুণোপাসনা। নির্গুণোপাসনার অর্থ ব্রহ্মে নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ না করিয়া কেবল উপাসকের চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া। সগুণোপাসনার অর্থ ব্রহ্মে নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তৎপ্রতি চিত্তবৃত্তি সমর্পণ দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। প্রথম প্রকারের উপাসনা প্রণালী জ্ঞানযোগ বা অধ্যাত্মযোগ নামে খ্যাত; দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই নির্গুণোপাসনা অতি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ, সগুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্গুণোপাসনার অধিকার জন্মে। এই নির্গুণোপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দু যোগিগণ সাধনা করিয়া আসিতেছেন। আর সর্ব্বসাধারণ লোকে সগুণোপাসনা অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিতে অধিকারী, তাঁহারা সগুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে

চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করেন। এই রূপে পূর্ব্বকাল হইতে দুই প্রকারের উপাসনা-প্রণালী হিন্দুসমাজে অবিরোধে প্রচলিত আছে। সগুণোপাসনা প্রণালীতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি অবলম্বনে উপাসনা করা হয় বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে সগুণোপাসনা সাকার উপাসনা নামে অভিহিত হইয়াছে; ও নির্গুণোপাসনাতে সেরূপ করিতে হয় না বলিয়া তাহা নিরাকার উপাসনা নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত এই নির্গুণোপাসনার কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই। আধুনিক নিরাকারবাদ পাশ্চাত্য Theism বা একেশ্বরবাদের অনুকরণে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। তাহা প্রবর্ত্তনের সময় হইতেই সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এক তুমুল মতবিরোধ ও প্রবল আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদির অতীত ব্রহ্মস্বরূপের কখনও উপাসনা হইতে পারে না।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"
ইত্যাদি।

অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় যাঁহা হইতে নিজ দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি

উপাস্য নহেন। যাঁহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাঁহা হইতে নিজশক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি উপাস্য নহেন। * বাস্তবিক নিরুপাধি চৈতন্য পদার্থ উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না। কারণ মনের অগোচর যাহা, বুদ্ধির অগম্য যাহা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ("যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ") ভাষা যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি কিরূপে ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের প্রয়োগ হইতে পারে?

বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—

"মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, আমাদের সে শক্তি নাই।"

(কৃষ্ণচরিত্র, ১ম সংস্করণ, ১৫ পৃঃ)।

পাশ্চাত্য দর্শনেরও সিদ্ধান্ত এই যে, Pure Being অথবা Noümenal Side of God আমাদের ধারণা হইতে পারে না, আমাদের উপাস্যও নহেন। Mansel বলেন,—

"Our conception of the Deity is then bounded by the

* "নেদং যদিদমুপাসতে" এই অংশের অর্থের জন্য শঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "নেদং ব্রহ্ম যদিদমিত্যুপাধিভেদ বিশিষ্টং অনাত্মেশ্বরাদ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি"। অর্থাৎ লোকে যে উপাধিভেদ বিশিষ্ট আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ—যেমন ঈশ্বরাদি, উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম নহে। এই propositionকে convert করিলে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

conditions, which bound all human knowledge, and therefore we cannot represent the Deity as He is, but as He appears to us."

(Metaphysics, p. 384)

অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্গুণ অবস্থা আমাদের চিন্তার অতীত; তাঁহার সগুণ প্রকাশমান অবস্থাই চিন্তনীয়, সুতরাং উপাস্য। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সোপাধি, সগুণ, সাকার ঈশ্বরোপাসনার বিধান রহিয়াছে। * এবং আমাদের দেশে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এদেশে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে বর্ব্বর জাতির পৌত্তলিকতা বা জড়-পূজা বোধে ইহার যথাসাধ্য নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা একথা বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, যীশুখ্রীষ্টকে মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ও মূর্ত্তিকে মধ্যে রাখিয়া হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যাহা হউক, ইউরোপীয় জাতি সুসভ্য, জ্ঞানী ও বিজ্ঞান তেজে তেজস্বী; সুতরাং তাঁহাদের কথার গুরুত্ব খুব অধিক। এক সময়ে তাঁহাদের যুক্তিতে ভারতবাসীর মন টলিয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কৃতবিদ্য ভারতসন্তান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মৃত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

* শাস্ত্রীয় নির্গুণোপাসনা ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা নহে। আবার আধুনিক নিরাকার উপাসনার ন্যায় তাঁহার গুণ চিন্তা করিয়াও উপাসনা নহে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা গেল।

প্রধান ছিলেন। আর কয়েক জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতে বিচলিত ও স্খলিত হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রধান ছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান মিশনারিগণ ইহাঁদিগকে সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিয়াছিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে ইহাঁরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দু জাতির সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও বর্ব্বর জাতির জড়-পূজা একই জিনিষ। এই কারণে ইহাঁরা হিন্দুর দেবদেবী মূর্ত্তিকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মতে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্র বিধেয়, সাকার দেবদেবীর পূজা ঈশ্বরোপাসনা নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। উপনিষৎ, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে তাঁহাদের মতে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমর্থনোপযোগী শ্লোক সকল সংগৃহীত হইল। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির "নেদং যদিদমুপাসতে" এই অংশের অর্থ করা হইল, "লোকে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর যে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্মোপাসনা নহে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই ঠিক ব্রহ্মোপাসনা"। * এইরূপে "একমেবা দ্বিতীয়ম্" † এই অদ্বৈত জ্ঞানসূচক মহাবাক্যের অর্থ করা হইল,—ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সুতরাং হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবদেবী ঈশ্বর নহে। এই আন্দোলনের ফলে এদেশে ব্রাহ্মসমাজ

---

* নগেন্দ্র বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন, "লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে"।

† পণ্ডিত মাত্রেই জানেন "একমেবা দ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতির অর্থ—"এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই"।

প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং এই সময় হইতেই জড় বিদ্বেষ অনেক লোকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিল। অনেক লোক সাকার উপাসনা ত্যাগ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় দীক্ষিত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত এই জড়-বিদ্বেষ অনেকের মধ্যে প্রবল রহিয়াছে। তাই নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্র তাঁহার (ব্রহ্মের) সমান অধিষ্ঠান; কিন্তু সাধুভক্তে তাঁহার উচ্চতম প্রকাশ, জড়ে তাঁহার নিকৃষ্টতম প্রকাশ। যদি তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া পূজা করিতে চাও, সাধুভক্তের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। অন্ধ হইয়া জড়মূর্ত্তির নিকট যাইতেছ কেন?" ("সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৫৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ সাধুভক্তগণ যেন একেবারেই শুদ্ধ চৈতন্যময় পদার্থ—তাঁহাদের মায় শরীর পর্য্যন্ত চৈতন্যে গড়া, তাঁহাদের মধ্যে একটুকুও জড়ত্ব নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে পূজা করিলে জড়পূজা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। * যাহা হউক, আমাদের ঈশ্বর উপাসনা করিতে হইলে, জড় পদার্থকে একেবারে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিলে যে চলিতে পারে না, তাহা অনেক ব্রাহ্মই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন: সেই জন্য নগেন্দ্র বাবু স্থানান্তরে (১১ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন,—

* শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় নব্যভারতে তাঁহার "সামাজিক উৎকট ব্যাধি" নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "প্রতিঘটে যখন ভগবান লীলা বিহার করিতেছেন, তখন হে আত্মাভিমানি, তুমি কাহাকে বাদ দিবে? যেখানে যতটুকু সত্য পরিহার করিবে, সেই খানেই ততটুকু অখণ্ড ভগবানকে খণ্ড, পূর্ণ ব্রহ্মকে অপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। একাধারে তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয় না, বিচিত্র আকারে, বিচিত্র ভাবে খণ্ডাকারে হয়, সমস্ত জগৎকে আত্মস্থ করিয়া, 'ঈশ্বর যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হও।" নগেন্দ্র বাবুর এ কয়েকটী কথা পাঠ করা উচিত।

"সাকারবাদীর অবলম্বন একটী ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকার বাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।"

অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবু প্রকারান্তরে বলিতেছেন, "ঈশ্বরোপাসনার একটা জড় অবলম্বন আবশ্যক, আমি মানি।" জড় পদার্থের একটা না একটা আকার আছেই। সুতরাং নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "নিরাকারবাদীর একটা সাকার জড়পদার্থের আবশ্যক।" কিন্তু তাহা হইলে সাকারবাদী ও নিরাকার বাদীর মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? যদি বল সাকারবাদীর মতে ঈশ্বরের হস্তপদাদি বিশিষ্ট অবয়ব আছে, নিরাকারবাদী তাহা মানেন না। তাহার উত্তর এই যে, সাকারবাদী এই "অখিল ব্রহ্মাণ্ড"কেই ঈশ্বরের সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত, সহস্র পদবিশিষ্ট বিরাট মূর্ত্তি বলিয়া জানেন, এবং দুই চারি কিংবা দশ হস্ত বিশিষ্ট দেব-দেবীর মূর্ত্তি সকল সেই বিরাট মূর্ত্তিরই ধ্যানোপযোগী ব্যষ্টিভাব মাত্র। এই তত্ত্ব অন্যত্র বিশদরূপে বুঝান হইল। * সুতরাং সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয়েই যদি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি, ঈশ্বর পূজার অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকিল না, নিরাকারবাদী সাকার উপাসনা স্বীকার করিলেন। আজ কাল কোন কোন ব্রাহ্ম আবার বলিয়া থাকেন, যাঁহাদের মন নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সাকার উপাসনাই বিধেয়। কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিবেন, যে সকল লোকেরই মন এরূপ অসমর্থ, তখন আমার বোধ হয়, উপাসনা বিষয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে না।

---

* তৃতীয় অধ্যায় দেখ।

"নিরাকার পদার্থ আছে কি না ?"

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" শীর্ষক প্রবন্ধে, প্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। বোধ হয় কেহই, নিরাকার পদার্থ নাই, একথা বলেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরাকার (নির্গুণ) ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

"মন ও মানসিক অবস্থা নিরাকার কিনা ?"

মন ও মানসিক অবস্থা সকল নিরাকার কি না ? নগেন্দ্র বাবু বলেন নিরাকার। এস্থলে তিনি নিশ্চয়ই মন, পাশ্চাত্য দর্শনের mind অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন, "মনের বিশেষ লক্ষণ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ; জড়ের বিশেষ লক্ষণ ; আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ ইত্যাদি (—৫ পৃষ্ঠা)। তিনি এই টুকু বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদের কোন কারণ ছিল না। তিনি আবার বলিতেছেন,—

"এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এ কথায় (অর্থাৎ মন নিরাকার) সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা বলেন মনের আকার আছে। মনের যে আকার আছে, তাহার প্রমাণ কি ? একটী প্রমাণ শুনা গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, মার্কিণ দেশীয় প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualists) পরলোকগত আত্মার ছবি দিতে পারেন। জীবিতকালে যে ব্যক্তির যে প্রকার মূর্ত্তি ছিল, তাহার সহিত উক্তরূপ ছবির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আত্মা বা মন নিরাকার পদার্থ হইলে উক্ত প্রকার ছবির উৎপত্তি কেমন করিয়া হইবে ? যাঁহারা এই তর্কটী উপস্থিত করেন, তাঁহারা প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মত কিছু জানেন না। প্রেততত্ত্ববাদীরা সূক্ষ্ম দেহে বিশ্বাস করেন। পরলোকগত আত্মা সূক্ষ্ম দেহী। * * * প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন, তাঁহারা যে ছবি দিয়া থাকেন,

তাহা মনের বা আত্মার ছবি নহে, ঐ সূক্ষ্ম দেহের ছবি। সুতরাং উক্তরূপ ছবির উৎপত্তি আত্মা বা মনের সাকারত্ব প্রতিপন্ন করে না।" (৩—৪ পৃ)

নগেন্দ্র বাবু এস্থলে একটা গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মনের আকার আছে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মন ও আত্মা এক পদার্থ বলেন না। তাঁহাদের মতে "মনঃ" একটী ইন্দ্রিয়; উহা জড় পদার্থ, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে রচিত। যথা, বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে—

"এতে পুনরাকাশাদিগত-সাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যেতে।"

অর্থাৎ ইহারা দুইটী (মন আর বুদ্ধি) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন হয়। "পঞ্চদশীতে" উক্ত হইয়াছে—

"সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদিন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥
তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধা।
মনোবিমর্শরূপং স্যাদ্বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥
রজোংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌ পাণিপাদ পায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥
তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান ব্যানৌ চ তে পুনঃ॥
বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"—তত্ত্ববিবেক, ১৯—২৩।

অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণ, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, রসন ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই পাঁচটী

সূক্ষ্ম ভূতের সাত্ত্বিকাংশ একত্র মিলিত হইয়া অন্তঃকরণ উৎপাদন করে। তাহা দুই প্রকার—মন ও বুদ্ধি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের রজঃ অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি উৎপন্ন হয়। আর তাহা পাঁচটী মিলিত হইয়া প্রাণ উৎপন্ন করে। প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উল্লিখিত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি, পাঁচটী প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশটীর সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর কহে।

অতএব আমরা দেখিলাম, হিন্দুদর্শনশাস্ত্র অনুসারে মন সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে রচিত একটী জড় ইন্দ্রিয়। তাহা আত্মা নহে। অতএব ইহার আকার অবশ্যই আছে। আর মার্কিন দেশীয় প্রেততত্ত্ববাদিগণ যদি পরলোকগত আত্মার সূক্ষ্ম দেহের ছবি তুলিতে পারেন, তবে সেই সঙ্গে মনেরও ছবি তোলা হয়। কারণ সূক্ষ্মদেহ কি জিনিষ, তাহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সূক্ষ্মদেহে যে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে রচিত মনও তাহাতে রচিত। সূক্ষ্মদেহের যে সপ্তদশটী অবয়ব, তাহার মধ্যে মনও একটী অবয়ব। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের ছবির সহিত মনের ছবিও অবশ্য উঠিয়া থাকে। সুতরাং মন সাকার। নগেন্দ্র বাবু হিন্দুদর্শনের "মনঃ" পাশ্চাত্য দর্শনের Mind এর সহিত গোলমাল করাতে তাঁহার যুক্তি Fallacy of ambiguous middle এই দোষে দূষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রহ্মজ্ঞান।

সাকার ব্যতীত নিরাকারের জ্ঞান হয় না ও সাকার উপাসনা ব্যতীত নিরাকার উপাসনা হয় না, এই মত খণ্ডন করিবার জন্য নগেন্দ্র বাবু, "সাকার আগে না নিরাকার আগে?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"পূর্ব্ববর্ত্তী কে? নিরাকার না সাকার? আমার যে জ্ঞান আছে তাহা কে বলিয়া দেয়? জ্ঞান আপনাকে আপনি প্রদর্শন করে। জ্ঞান আপনার সাক্ষী আপনি। জ্ঞান দ্বারাই বুঝিতে পারি যে জ্ঞান রহিয়াছে। সূর্য্য যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞানও সেইরূপ আত্মজ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত। জড় আছে, সাকার পদার্থ আছে, কে বলিয়া দেয়? * * জ্ঞান নিজের সত্তা নিজে প্রদর্শন করে, এবং এই সুবিশাল বহির্জ্জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়। * * * এখন দেখ, আগে কি, আর পরে কি? নিরাকার আগে, না সাকার আগে? নিরাকার জ্ঞান সাকার জ্ঞানের কথা বলিয়া দেয়, তবে আমরা সাকারের বিষয় জানিতে পারি। নিরাকার আগে, সাকার পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপর সাকার প্রতিষ্ঠিত। নিরাকার ভিন্ন সাকারের সত্তা বৃথা। নিরাকারের ভিত্তি মূলে সাকার প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরাকার দ্বারা সাকার জানিতে পারি।" (৬—৭ পৃষ্ঠা)"

"জ্ঞানে"র অর্থ সাধারণতঃ তিন প্রকার। জ্ঞান অর্থে যাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়। জ্ঞান অর্থে জ্ঞাতব্য বা জ্ঞাত বিষয়, অর্থাৎ রূপ রসাদি। আর জ্ঞান অর্থে জ্ঞানলাভের ক্রিয়া, অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, চিন্তন ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান কথা আত্মা বা ব্রহ্মের প্রতিও প্রযুক্ত

হয়; যেমন, "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম"। এখন নগেন্দ্র বাবু উদ্ধৃতাংশে কি অর্থে জ্ঞানশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। "জ্ঞান" অর্থে যদি আত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, যেমন "জ্ঞান আপনার সাক্ষী আপনি।" তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। জ্ঞান ব্রহ্মপদার্থ হইলে, তাহা নিরাকার, ও সাকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু নগেন্দ্র বাবু যখন পর মূহূর্ত্তেই বলিতেছেন "জ্ঞান সুবিশাল বহির্জ্জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়' তখন এস্থলে জ্ঞানকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম করিলে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। আমরা বহির্জ্জগতের সংবাদ ইন্দ্রিয় দ্বারাই পাইয়া থাকি। ইন্দ্রিয় অবশ্যই ব্রহ্ম নহে। তাহা হইলে "জ্ঞান" অর্থে যদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনঃ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি হয়, তবে তাহারা জড় পদার্থ, ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। জড়পদার্থ হইলেই তাহারা সাকার হইল। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত 'নিরাকার আগে, সাকার পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপর সাকার প্রতিষ্ঠিত।' কোন ক্রমেই টিকিতে পারে না।

নগেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই জ্ঞাতব্য বিষয় অর্থে জ্ঞান শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কারণ তিনি বলেন, "জ্ঞান এই সুবিশাল বহির্জ্জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়," অতএব জ্ঞান রূপ রসাদি, হইলে তাহা রূপরসাদির সংবাদ কি প্রকারে আনিয়া দিতে পারে? আর 'জ্ঞান' অর্থে জ্ঞানের ক্রিয়া (দর্শন, স্পর্শন, চিন্তন ইত্যাদি) এস্থলে অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে ও বিষয় আছে। কর্ত্তা, করণের সাহায্যে

বিষয় লইয়া ক্রিয়া করেন। যেমন দর্শন একটী ক্রিয়া; দর্শন বলিলেই তাহার পূর্ব্বে দ্রষ্টা দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপ এই তিনটী বস্তু থাকা ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং জ্ঞান অর্থে যদি জ্ঞানের ক্রিয়া অর্থাৎ জানা হয়, তবে তাহা 'আপনার সাক্ষী আপনি' কি প্রকারে হইবে? কারণ ক্রিয়ার সাক্ষী কর্ত্তা। আর জ্ঞানের অর্থ জ্ঞানের ক্রিয়া ধরিয়া লইলে, তদ্দ্বারা আমরা যে বাহ্য জগতের সংবাদ পাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন আধুনিক ইয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে আমাদের জ্ঞান (perception or knowledge) হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বহির্জ্জগতের কোন সত্তা নাই। আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়া আমাদের নিকট বহির্জ্জগৎই আছে। অধ্যাপক বেন (Bain) বলেন,

"There is no such thing known as a tree wholly detached from perception, and we can speak only of what we know"—

(Mental and Moral science, p. 97). অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র রূপে বৃক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ আমরা জানি না, এবং আমরা যাহা জানি, তাহাই কেবল ব্যক্ত করিতে পারি। নগেন্দ্র বাবু এই মত স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, কেন না তিনি বলেন—

"নিরাকার ভিন্ন সাকারের সত্তা বৃথা। নিরাকার ভিত্তি মূলে সাকার প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরাকার দ্বারা সাকারকে জানি। সাকার জড়জগৎ—এই সাকার দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের সত্তাকে দেখাইয়া দেয়? ঐ নিরাকার জ্ঞান। নিরাকার না থাকিলে সাকার কোথায় পাইতে?"

নগেন্দ্র বাবু সাকারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু উড়াইয়া দেওয়া তত সোজা নয়। যে সকল পাশ্চাত্য

দার্শনিকগণ জড়-জগতের সত্তা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে বলেন, তাঁহারাই আবার জ্ঞানের ক্রিয়াতে জড়-জগতের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। এমন কি অধ্যাপক (Bain) বেন আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান বাহ্যিক জগৎ হইতে ভূয়োদর্শন দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া মানেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান sensation (ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি) ও muscular feeling (শারীরিক অনুভূতি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (*) আবার sensation (†) জড়-জগতের সাহায্য ভিন্নও muscular feeling (‡) জড় শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মতে আমাদের জ্ঞান, সাকার হউক বা নিরাকার হউক, এই সাকার জড়-জগৎ ও সাকার শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান যদি নিরাকার হয়, তবে তাহা নিশ্চয় সাকার জগতের (§) উপর প্রতিষ্ঠিত।

(*) "*Mental and moral Science*" *BK. II. chap. VI.*দেখ।

(†) "A sensation is defined as the mental impression, feeling or conscious state, resulting from the action of *external things* on some part of the body, called on that account sensitive" *ibid.* p. 27. (*The Italics are ours*)

অর্থাৎ বহির্জ্জগতের কোন পদার্থ শরীরের উপর ক্রিয়া করিলে তাহা হইতে sensation উৎপন্ন হয়।

(‡) "The muscular feelings agree with the sensations of the senses in being primary sources of feeling and of knowledge, localized in a peculiar set of organs" p. 13, অর্থাৎ শরীরের কোন কোন বিশেষ অঙ্গ হইতে muscular feeling উৎপন্ন হয়।

(§) মনুষ্য শরীরও বাহ্য জগতের অন্তর্গত—" Our own body is a part of our object experience"—p. 200.

অতএব আমরা দেখিলাম, আত্মা বা ব্রহ্ম ভিন্ন জ্ঞান যে অর্থেই ব্যবহার কর না কেন, তাহা সাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সাকারের পরবর্ত্তী।

আর একটী কথা। নিরাকার জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্ম, কিংবা আত্মা, বা আত্মার শক্তি বিশেষ) আগে, আর সাকার (জড়) পরে, ইহা যেন মানিলাম। কিন্তু তাহা হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত পাই না যে, মানুষের নিরাকার পদার্থের জ্ঞান আগে হয়, আর সাকার পদার্থের জ্ঞান পরে হয়; মানুষের নিরাকার জ্ঞানের উপর সাকার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ আমাদের সাকার পদার্থের জ্ঞান আগে, ও নিরাকার পদার্থের জ্ঞান পরে, আমাদের নিরাকার পদার্থের জ্ঞান সাকার পদার্থের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য আমাদের সাকার ব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না। এই তত্ত্ব বিস্তারিত রূপে বুঝান যাইতেছে।

মানুষের নিরাকার-জ্ঞান আগে, না সাকার-জ্ঞান আগে?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, জড়-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা কখন জীবাত্মার কল্পনাও করিতে পারি না। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আত্মা জড় শরীরে আবদ্ধ ও চতুর্দ্দিকে জড়-জগৎ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মৃত্যুর পরে ও জীবাত্মা পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে আবদ্ধ থাকে। আর যদি মুক্তি হয়, তবে সে আত্মা আর মানুষের আত্মা থাকে না, ব্রহ্মে লীন হইয়

যায়। সুতরাং আমাদের জীবাত্মা জড়-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকাতে, আমাদের যে জ্ঞান, তাহা কখনও জড়-জগৎ সম্বন্ধীয় ভিন্ন শুদ্ধ চৈতন্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে না। যদি কখনও হয়, তবে তাহা আমাদের সাকার পদার্থের জ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে ইউরোপীয় আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও একমতাবলম্বী। Empirical ও Intuitional উভয় সম্প্রদায়ই এই মত সমর্থন করেন। তাঁহাদের মত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

মানুষের কি রকমে জ্ঞান জন্মে, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে Empirical School বলেন, আমাদের যত কিছু জ্ঞান হয়, সকলই ভূয়োদর্শন (experience) দ্বারা। ইঁহাদের মতে জড় জগৎ হইতেই আমাদের জ্ঞানের আরম্ভ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন (mind) জড় জগতের চিত্র (image) সকল সংগ্রহ ও আত্মসাৎ (assimilate) করে। সেই সকল চিত্র স্মৃতি (memory), বিচার (judgment), সূক্ষ্মীকরণ (abstraction),বিতর্ক (reason), এবং কল্পনা(imagination)এই সকল মানসিক বৃত্তির সাহায্যে আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান জন্মায়। ইঁহাদের মতে সূক্ষ্ম সাধারণ ভাব (general ideas) ও গুণবাচক ভাব (abstract ideas) সকল আমাদের বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক (individual and concrete) জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং যদি গুণবাচক জ্ঞান ও সূক্ষ্ম সাধারণ ভাবসূচক জ্ঞানকে নিরাকার জ্ঞান বলা যায়, তবে ইঁহাদের মতে তাহা সাকার ও সগুণ (individual and concrete) পদার্থের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তাহার পরবর্ত্তী। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

"সৌন্দর্য্য" একটী গুণবাচক ভাব। ইহার জ্ঞান আমাদের কি প্রকারে হইল? না, নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সাকার সুন্দর পদার্থ দেখিয়া বা শুনিয়া; যথা সুন্দর ফুল, সুন্দর মূর্ত্তি, সুন্দর সঙ্গীত। "প্রেম" একটী সাধারণ ভাব (general idea)। ইহার জ্ঞান আমাদের কিরূপে হইল? কোন কোন বিশেষ বিশেষ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বা শুনিয়া; যেমন রামের প্রতি তাহার স্ত্রীর প্রেম, গোপালের প্রতি তাহার বন্ধুর প্রেম, শ্যামের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সকল ব্যক্তির বিভিন্ন রকম প্রেম,এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ সাকার ঘটনা (image or picture) দ্বারা জানা গিয়াছে। এখন "সৌন্দর্য্য" ও "প্রেম"কে যদি নিরাকার বস্তু বলা যায়, তবে ইহার জ্ঞান নিশ্চয়ই সাকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অন্য সম্প্রদায় (Intuitional School) বলেন, আমাদের সকল জ্ঞানই সাকার জড়জগৎ হইতে উৎপন্ন, কেবল কয়েকটী সাধারণ ভাব (ideas) আমাদের সহজাত। তাহা এই,—দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ ভাব (ideas of space,time, cause and effect); গণিতের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল (axioms of mathematics); পাপ পুণ্যের ভাব (ideas of right and wrong); ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ভাব (ideas of God and immortality of soul)*

* "While the great mass of our knowledge is obviously attained in the course of our experience of the world, it is contended by ome philosophers that certain elements exist

ইহাঁরা বলেন, আমরা এই সকল ভাব জড়জগৎ হইতে পাই না, এবং জড়জগতে আমাদের এই সকল বিষয়ের জ্ঞান, আমাদের ইহাদের সম্বন্ধীয় সহজাত ভাব হইতে উৎপন্ন। নগেন্দ্র বাবু বোধ হয় এই মতাবলম্বী, কারণ, তিনি বলেন, সাকার জ্ঞান নিরাকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। হিন্দুরাও Intuitional Schoolর এই মত স্বীকার করিতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জীবাত্মার পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করেন। কিন্তু এস্থলে ভাব (idea) ও জ্ঞান (knowledge) এই দুইটীর পার্থক্য বুঝিতে হইবে। মনে কর "ঈশ্বর আছেন" এই একটী ভাব (idea) বা সংস্কার আমার মনে শৈশব হইতেই আছে; যখন আমার জ্ঞান হয় নাই, যখন আমি কোন বস্তুর বিচার করিতে পারি নাই, তখনও (*) ইহা আমার মনে সংস্কারাবস্থায়

---

in the mind at birth ; as for example, our ideas of Space Time and Cause ; the Axioms of Mathematics ; the distinction of Right and Wrong ; the ideas of God and immortality."
—*Bain's Mental and Moral Science* *p. 181.*

(*) শৈশবে আমাদের কোন জ্ঞান জন্মে না। এ বিষয়ে Herbert Spencer বলেন —

"In brief, a true cognition is possible only through an accompanying recognition, and hence there can be no cognition proper ; the reply is, *that cognition proper arises gradually, that during the first state of incipient intelligence, before the feelings produced by intercourse with the outer world have been put into order, there are no cognitions, strictly so called ; and that, as every infant shows us, these slowly emerge out of the confusion of unfolding consciousness as fast as the experiences are arranged into groups*—as

ছিল। কিন্তু যখন আমার জ্ঞান হইল, যখন আমি এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু চিনিতে পারিলাম, তখন এই সংস্কার জড়জগতের সাহায্যে পরিস্ফুট হইয়া আমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানে পরিণত হইল, অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কয়েকটী ভাব (যেমন তাঁহার অস্তিত্ব প্রভৃতি) যেন আমাদের স্বভাবজাত বলিয়া মানিলাম, কিন্তু আমাদের সেই সকল ভাবের যে জ্ঞানে বা ধারণায় পরিণতি, তাহা ভূয়োদর্শন (experience) দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এখন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব নিরাকার হইলেও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ধারণা যে নিরাকার, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটী ভাব বা সংস্কার; তাহা নিরাকার যেন মানিলাম, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব চিন্তা করিতে হইলে যে, আমি নিরাকার পদার্থের চিন্তা করি, তাহা কে বলিতে পারে? ব্যবহারিক জগতে আমরা বস্তু ও জাতি বাদ দিয়া কখনও দেশ ও কালের (time) জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। গণিত শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি প্রয়োগ দ্বারাই দৃষ্ট হয়, ও পরে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত (concrete example) হইতে তাহাদিগকে (generalise) সাধারণ সূত্রাকারে গ্রথিত করা হয়। পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ আমরা আমাদের বিশেষ বিশেষ

---

fast as the most frequently repeated sensations, and their relations to each other, become familiar enough to admit of their recognition as such and such, whenever they occur"—*First Principles vol. I. p. 80.* (*Italics* আমাদের। বোধ হয়, এ কথায় কোন Intuitionalist আপত্তি করিতে পারেন না)।

কার্য্যেই (individual acts) দেখিয়া থাকি। সেই রূপ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বা সংস্কার সকল (ideas), আমাদের সহজাত হইলেও, আমরা প্রথমতঃ জগতে তাহাদের প্রকাশ দেখিয়া তাহাদের জ্ঞান লাভ করি। জগৎ বাদ দিয়া আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। (*) এতদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যত জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা এই তিনটী ভাবে সীমাবদ্ধ—তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা, এবং তিনি জগতের সংহারকর্ত্তা। এই জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই, কখন পারেও না। † যদি পারে ও যখন পারে, তখন মানুষ আর

(*) এ মনুষ্য শব্দেরাও জগতের অন্তর্গত ধরা হইল।

† ব্রহ্মকে যে 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং' বলা হয়, তাহাও এই জগতের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া। এই জড়জগৎ হইতে তাঁহার রূপ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, এই বাক্য দ্বারা ইহাই প্রকাশ হয়। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম 'সত্যং' জগৎ অজ্ঞান অর্থাৎ মায়াময়, তিনি 'জ্ঞানং' জগৎ সান্ত, ক্ষুদ্র; তিনি 'অনন্তম্'; সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় 'সত্যং জ্ঞান মনন্তম্' আমাদের এই জ্ঞান ও জগৎমূলক, সাকার জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুনশ্চ শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম "অস্থূল মনণ্বহ্রস্বম দীর্ঘম লোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরস মগন্ধম চক্ষুষ্কমশ্রোত্র মবাগমনোঽতেজস্কম প্রাণম মুখমমাত্রম্" অর্থাৎ তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, তিনি তরল নহেন, আকাশ নহেন, সঙ্গযুক্ত নহেন, রসযুক্ত নহেন, ছায়াযুক্ত (আলোক) নহেন, আবার অন্ধকারও নহেন; তিনি বায়ু নহেন, গন্ধযুক্ত নহেন, চক্ষুযুক্ত নহেন, কর্ণযুক্ত নহেন, বাকযুক্ত নহেন; তাঁহার মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই; তাঁহার কাহারও

মানুষ থাকে না, তাহার তখনকার জ্ঞান আর মানুষের জ্ঞান নহে, তখন সে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইয়া যায়। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একরূপ তার্কিক জ্ঞান (theoretical or speculative knowledge) হইতে পারে; যেমন নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। কার্য্যকালে সে জ্ঞানের কোন উপকারিতা নাই। সে জ্ঞান লইয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁহার ধ্যান, ধারণা করিতে পারি না। অতএব আমরা দেখিলাম, ঈশ্বর সম্বন্ধীয়

সহিত তুলনা হয় না। এস্থলেও ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান জড়জগৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেখান হইতেছে, কিন্তু তাহা positive প্রণালীতে না হইয়া negative প্রণালীতে। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে positive জ্ঞান হইল, ব্রহ্ম জগতের কোন বস্তুর ন্যায় নহেন, ইহা বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে negative জ্ঞান হইল। কিন্তু এই উভয় প্রকার জ্ঞানই জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই জগতে জ্ঞান আছে বলিয়াই, আমরা ব্রহ্মকে জ্ঞানময় বলি, একথা নগেন্দ্র বাবুও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" প্রথম খণ্ডে "মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না?" এই প্রবন্ধে ঘড়ীর দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"আমরা তিনটী ঘড়ীর কল্পনা করিব। প্রথম ঘড়ী পৌত্তলিক, দ্বিতীয়টা একেশ্বরবাদী; এবং তৃতীয়টা অজ্ঞেয়তাবাদী। পৌত্তলিক ঘড়ী বলিল,—আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি একটা বড় ঘড়ী; আমাদের যেমন স্প্রিং, চক্র প্রভৃতি আছে, তাঁহারও সেইরূপ আছে; আমরা যেমন সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন; আমরা যেমন দুইটা কাঁটা দ্বারা সময় ঠিক্ করিয়া দি, তিনিও সেইরূপ করেন।

একেশ্বরবাদী ঘড়ী এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—একরূপ বলা অত্যন্ত যুক্তবিরুদ্ধ। আমাদের যিনি নির্ম্মাতা, তিনি আমাদের মতই ঘড়ী, এইরূপ

প্রকৃত জ্ঞান (realization as opposed to speculative knowledge) আমাদের জগতের জ্ঞানের সহিত না হইয়া হইতে পারে না। এখন আমরা দেখিব, এই জগতের জ্ঞান আমাদের সাকার বলিয়া, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকার না হইয়া পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান যদি কখনও নিরাকার হয়, তবে তাহা এই সাকার জ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্প্রিং প্রভৃতি বিশিষ্ট, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। তবে যখন দেখিতেছি যে, আমাদের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথা বলিতে হইবে যে, আমাদের নির্ম্মাতার জ্ঞান আছে। কৌশলেই জ্ঞান প্রকাশ পায়, নির্ম্মাতা অবশ্যই জ্ঞানবিশিষ্ট।"

আমাদের অজ্ঞেয়তাবাদী ঘড়ীর কথায় কাজ নাই। একেশ্বর বাদী ঘড়ী নিজের মধ্যে "জটিল কৌশল" দেখিয়া মনে করিতেছে "আমাদের নির্ম্মাতা জ্ঞানী।" রূপক ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমরা মনুষ্য শরীর ও জগতে জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়াই অনুমান করি "ঈশ্বর জ্ঞানময়"। এতদ্ভিন্ন আমাদের ঈশ্বরের যে জ্ঞান আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা এই সাকার জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সাকার জগতের পরবর্ত্তী।

আর একটী কথা। প্রকৃত পক্ষে, "পৌত্তলিক ঘড়ী" ও "একেশ্বরবাদী ঘড়ী" উভয়েই এক রকম যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। "একেশ্বরবাদী ঘড়ী" মনে করিবেন না যে, তিনি এই যুক্তি দ্বারা "পৌত্তলিক ঘড়ীকে" পরাস্ত করিলেন। পৌত্তলিক ঘড়ী তাহার নির্ম্মাতাতে যেমন তাহার নিজের স্প্রিং, চক্র, টিক্ টিক্ শব্দ প্রভৃতি আরোপ করিতেছে, একেশ্বরবাদী ঘড়িও তেমনি তাহার নির্ম্মাতাতে তাহার নিজের জ্ঞান শক্তি আরোপ করিতেছে।

জগৎ বলিতে দুইটী বস্তুর সমষ্টি বুঝায়। এক স্থূল বা জড় জগৎ (material world)। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক জগৎ (mental world)। আমরা প্রথমে দেখিব, স্থূল জগতে আমা-

---

রূপক ভাঙ্গিয়া বলিলে, ব্রহ্মে যেমন আকারাদি নাই, তেমন জ্ঞানও নাই। কারণ সকলেই জানেন, আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা একটী আপেক্ষিক দ্বৈত ভাব relative idea; জ্ঞান বলিলেই তাহার সঙ্গে অজ্ঞান আসে। আমাদের অজ্ঞান আছে বলিয়াই, আমাদের জ্ঞান আছে। অজ্ঞান না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে জ্ঞান, অজ্ঞান সকলই রাখিয়া যাইতে হয়।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কংপশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃনুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ?"

অর্থাৎ যতক্ষণ পরমাত্মা হইতে অন্য পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকে, (অর্থাৎ যখন দ্বৈত জ্ঞান থাকে) ততক্ষণ একে অন্যকে ভিন্ন বলিয়া দেখে, ভিন্ন বলিয়া ঘ্রাণ করে, ভিন্ন বলিয়া আস্বাদন করে, ভিন্ন বলিয়া বলে, ভিন্ন বলিয়া শ্রবণ করে, ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ভিন্ন বলিয়া স্পর্শ করে ও ভিন্ন বলিয়া জানে। কিন্তু যখন সকলই পরমাত্মা এই অদ্বৈতবোধ হয়, তখন এই সকল দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি কিছুই থাকে না, তখন কোন জ্ঞানই থাকে না, কারণ কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে

দের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার না হইয়া নিরাকার হইতে পারে না। পরে আমরা দেখিব, সূক্ষ্ম জগতে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকার না হইয়া, নিরাকার হইতে পারে না।

মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহার দ্বারা সকলকে জানা যায়, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে?

এই শ্রুতিবাক্য অনুবাদ করিয়া পঞ্চদশীকার বলিতেছেন,—

"ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈত-বর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়েহিনো॥"

১১ পরিচ্ছেদ, ১৪॥

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ ত্রিপুটী বর্জ্জন হেতু কেবল ভূমা মাত্র বিদ্যমান থাকেন। প্রলয়েও সেই ত্রিপুটী থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞান নাই। যেমন আকারও নাই, তেমন জ্ঞানও নাই। যেথানে আকার (জগৎ) সেথানেই জ্ঞান। আকার ও জ্ঞানের সহিত অভেদ সম্বন্ধ। সেই অজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু যে ঈশ্বর (অর্থাৎ জগৎ-সংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম) তাহাতে জ্ঞান আছে, আবার আকারও আছে। সুতরাং একেশ্বরবাদী বড়ী যখন তাহার নির্ম্মাতাতে তাহার নিজের জ্ঞান আরোপ করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্প্রিং চক্রও আরোপ করিল, কিন্তু মনে মনে, প্রকাশ্যে নহে। সে স্প্রিং চক্রেই জ্ঞানের কার্য্য দেখিতেছে, অন্য কোথায়ও সে জ্ঞান দেখিতে পারে না; যখনই সে জ্ঞানের কথা ভাবে, তখনই সে স্প্রিং চক্রের কথা ভাবে। সুতরাং জ্ঞান ভাবিতে হইলে অবশ্যই তাহাকে স্প্রিং চক্র ভাবিতে হইবে। অতএব তাহার নির্ম্মাতাতে জ্ঞান আছে, ইহা তাহাকে ভাবিতে হইলে, তাহাতে স্প্রিং চক্রও আছে ইহা তাহাকে ভাবিতে হইবে।

জড়জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, আমরা স্থূল জগতে জাতিবাচক (concrete) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে অভ্যাস না করিলে, কখনই গুণবাচক (abstract) বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। আমাদের কোন গুণবাচক বস্তু চিন্তা করিতে হইলে, সেই জাতিবাচক বস্তুর চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে, তাহা পারা যায় না। বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বৃক্ষের জ্ঞান জন্মা আবশ্যক। একটী বালকের জ্ঞান হওয়া অবধি, সে বৃক্ষই দেখিতেছে; বৃক্ষত্ব কি, সে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। যখন তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, যখন সে নানা-রকম বৃক্ষ দেখিয়া তাহাদের সাধারণ গুণ, ভাব বা ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তখনই সে বৃক্ষত্ব কি, তাহা চিন্তা করিতে পারিবে, বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হইবে। এবং পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলেই তাহাকে একটী বিশেষ (individual) বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। বৃক্ষ বাদ দিয়া কখনও সে বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে পারিবে না।* অতএব

* "Hence abstraction does not properly consist in the mental separation of one property of a thing from the other properties—as in thinking of the roundness of the moon apart from the luminosity and apparent magnitude, *Such a separation is impracticable, no one can think of a circle without colour and a definite size............*

"Neither can we have a mental conception of any property abstracted from all others ; we cannot conceive a circle except of some colour and some size ; we cannot con-

দেখা গেল, আমাদের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ও তাহা হইতে অভিন্নভাবে অনুভূত হয়। এখন যদি গুণবাচক পদার্থকে নিরাকার বলা যায়, তবে তাহার জ্ঞান, সাকার জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রমাণিত হইল। এখন এই জড় জগতে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হয় জাতিবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে, না হয় গুণবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে। এই উভয় প্রকার জ্ঞানই সাকার; সুতরাং জড় জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকারই হইবে। এখন কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

নগেন্দ্র বাবু একস্থানে লিখিয়াছেন, "নিরাকারবাদীর কি অবলম্বন নাই? এ কথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ। * * * শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই! সকলই তাঁহার পূজার আয়োজন।"

("সাকার ও নিরাকার উপাসনা" ১১ পৃষ্ঠা)

---

ceive justice except by thinking of just actions"—*Bain's Mental and Moral Science. pp. 177-180.* এতদ্ভিন্ন Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Dugald Stewart, Thomas Brown, Hamilton, James Mill, প্রভৃতি আধুনিক অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় দার্শনিকগণ এই মতের সমর্থন করেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইল না। (Bain's Mental and Moral Science এর পরিশিষ্ট দেখ)।

এখন কথা হইতেছে, নগেন্দ্র বাবু এস্থলে যে সকল নিরাকার ব্রহ্ম-পূজার অবলম্বনের কথা বলিলেন, তদ্দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, না সাকার ব্রহ্মজ্ঞান হয়? নগেন্দ্র বাবু যে সকল অবলম্বনের কথা উল্লেখ করিলেন, ইহার মধ্যে কতকগুলি জাতিবাচক পদার্থ, (যেমন, "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ" যথা—"চন্দ্র, সূর্য্য, তৃণকণা, বটবৃক্ষ, বালুকাকণা," ইত্যাদি); আর কতকগুলি গুণবাচক পদার্থ, যেমন শিশুর সরলতা, মাতৃ-স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি। উপরে যেরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাতে আমাদের এই সকল জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান অবশ্যই সাকার। তাহাদের মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাও সাকার ব্রহ্মজ্ঞান ও সাকার ব্রহ্মদর্শন।

এই জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু তেজস্বী, তাহাই বিশ্বপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদিগের মধ্যে আমরা সেই "আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পরম পুরুষের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইলে, আমরা কখনও তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিতে পারি না। তাঁহার সত্তা এই সকল জড় পদার্থের সহিত মিলিত ভাবে দেখিতে পাই। এই সকল পদার্থের সহিত মাখামাখি ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকি। ইহাদের আকার, অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি গুণের সহিত মাখামাখি ভাবে ঈশ্বরের সত্তা আমরা অনুভব করি। এই সৌন্দর্য্যময় জগতের সহিত মাখামাখি ভাবে, অভেদরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আমরা বলি, "আহা, তুমি কি সুন্দর!" এ জগতে প্রবাহিত দয়া-স্রোতস্বতীর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়া

আমরা বলি,—"আহা, তুমি কিরূপ দয়ালু!" এই জগতের সৌন্দর্য্য, জগতের দয়া, জগতের প্রেম, জগতের পবিত্রতার সহিত তাঁহাকে একীভূত (identified) মিলিত দেখেন বলিয়া, ভক্তগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য, দয়া, প্রেম ও পবিত্রতার জয়-ঘোষণা করেন। তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও, আমরা জগতের গুণ সকল তাঁহাতে আরোপ করিয়া বলি, তিনি সগুণ। তিনি বস্তুতঃ নিরাকার হইলেও, সাকার জগতের সহিত তাঁহাকে আমরা দর্শন করি বলিয়া, তিনি আমাদের নিকট সাকার। এখন এই সকল জড় পদার্থের আকারাদির সহিত মাথামাথি ভাবে ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা, এবং প্রতিমার আকারাবয়ব ও রূপের সহিত মাথামাথি ভাবে ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা, এই উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। সুতরাং প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা হইলে, নগেন্দ্র বাবুর এই নিরাকার উপাসনা পৌত্তলিকতা না হইবে কেন?

যদি বল, আমি এই সকল সাকার জড় পদার্থের সহিত মাথামাথি ভাবে ঈশ্বরকে দেখি না, জড়-জগতে তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল অবগত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। কিন্তু তাহা হইলেও তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, জড়জগত হইতে উৎপন্ন হইল, জড়-জগৎ আছে বলিয়া তুমি সিদ্ধান্ত করিলে, ইহার এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন। জড় জগতের সৃষ্টি-কৌশল, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দেখিয়া তুমি অনুমান করিলে, ইহা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ধারণা জড়-জগৎ হইতে উৎপন্ন হইল, নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান সাকারের উপর নির্ভর করিল। অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সংস্কার (idea)

বীজভাবে তোমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু তাহার জ্ঞান (knowledge) রূপে পরিণতি এই সাকার জড় জগতের উপর নির্ভর করিল।

আর একটী কথা। নিরাকার উপাসনার অর্থ যদি কেবল ধন্যবাদ দেওয়া হয়, আর এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ যদি কেবল ঈশ্বরের স্মারক চিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তবে সে উপাসনার দ্বারা একটা মৌখিক আড়ম্বর (formality) রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। ঐ সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পটী দেখিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, আমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল, আমি তাঁহার উপাসনা করিলাম,—"হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য, কেন না তুমি এই পুষ্পটীকে সৃষ্টি করিয়াছ"। এখানে কেবল এই পুষ্পের সহিত ঈশ্বরের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধই মনে পড়িল, আমি অনুমান দ্বারা বুঝিলাম, ঈশ্বর ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইহাতে মৌখিক উপাসনা হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হইল কৈ? যতক্ষণ ঐ পদ্মপুষ্পের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আমি আত্মহারা না হইব, যতক্ষণ ঐ পদ্ম-পুষ্পকে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য-প্রবাহের একটী তরঙ্গ বলিয়া না দেখিতে পারিব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সুন্দর-পদ্মপুষ্পে, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আকর শ্রীশ্রীজগন্মাতার মুখশ্রী প্রত্যক্ষ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার হৃদয়ের পিপাসা মিটিবে কিরূপে? এই রূপে একটী দিব্যকান্তি নারীমূর্ত্তি দেখিয়া, তুমি তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, তোমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল। তুমি বলিয়া উঠিলে "হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য, ধন্য

তোমার শিল্প-নৈপুণ্য, যেহেতু এই অনুপম রমণী-মূর্ত্তি তোমার হস্তে নির্ম্মিত হইয়াছে।" এখানেও এই রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-দ্বারা তাহার কর্ত্তাকে তুমি অনুমান করিয়া ধন্যবাদ দিলে, কিন্তু এই ধন্যবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে তোমার চিত্ত ঈশ্বর হইতে যত দূরে ছিল, ধন্যবাদ দেওয়ার পরেও ততটুকু দূরেই রহিল, এই ভাবে রমণী-মূর্ত্তি দর্শন দ্বারা তোমার চিত্তের বিশেষ কোন উন্নতি হইতে পারিল না।* তুমি এই রমণী-মূর্ত্তিকে কেবল একটী রমণী-মূর্ত্তি বলিয়া দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইলে, কিন্তু আমি তাহাতে আর এক সত্তা দেখিতেছি। এই নারী মূর্ত্তি যাঁহার সত্তায় সত্তাবতী, যাঁহার অবলম্বনে অবস্থিতা, যাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটার কণামাত্র পাইয়া ইহা সুন্দরী,— এই রমণী-মূর্ত্তি যাঁহার মাতৃভাবের স্থূল অভিব্যক্তি, যিনি এই রমণীর ছলে জগতে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে বিরাজমানা, আমি সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননীকে এই রমণীতে অভেদরূপে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, দেখিয়া, মাতাকে সম্মুখে পাইয়া, প্রণাম করিতেছি,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

---

* ঈশ্বরকে জগতের সহিত মাখামাখি দেখিতে অভ্যাস না করিলে, অর্থাৎ অন্য কথায় জগতের রূপ ও গুণাদি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে সাকার ও সগুণ ভাবে উপাসনা করিতে অভ্যাস না করিলে যে ভক্তিলাভ হইতে পারে না, তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে, ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণে ব্যাখ্যা করা হইল।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ।"—চণ্ডী*।

উপরে জাতিবাচক পদার্থে সাকার ঈশ্বর-চিন্তার কথা বলা হইল। এইরূপে, গুণবাচক পদার্থে, যেমন, "শিশুর সরলতায়" ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলেও, আমরা পৌত্ত-লিকতার হাত এড়াইতে পারি না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলে, অবশ্যই বৃক্ষ চিন্তা করিতে হইবে। "শিশুর সরলতা" চিন্তা করিতে হইলে সাকার সাবয়ব শিশুর মুখশ্রী, কিংবা তাহার সরলতাব্যঞ্জক কোন বিশেষ (concrete) কার্য্য—চিত্র (picture) অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই "সরলতায়" ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে, শিশুর মুখাবয়ব সেই ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। অতএব ইহাও প্রতিমাতে ঈশ্বর চিন্তার ন্যায় সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতা হইল।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, হিন্দুর প্রতিমাপূজা ও নিরাকারবাদীর জড়জগৎ সাহায্যে ঈশ্বরের উপাসনা এক নহে। কারণ, হিন্দু মূর্ত্তিকেই পূজা করেন, আর ব্রাহ্ম জড়বস্তুর সাহায্যে নিরাকার ব্রহ্মকে পূজা করেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কেবল জড়-মূর্ত্তির পূজা করেন, ইহা কে বলিল? ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-খণ্ডের (শিব লিঙ্গের) নিকট হিন্দু প্রণাম করেন,—

---

* যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে দেবী, সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তি, এবং ত্রিভুবনে যত স্ত্রী, সমস্তই তোমার অংশ বিশেষ। তুমি একাই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; তুমি স্তবাগণের শ্রেষ্ঠা, তোমার স্তব আর কি প্রকারে হইতে পারে?

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতিঃ পরমেশ্বর॥"

যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জগতের এই কারণ ত্রিতয়ের হেতু, যিনি শান্ত, সেই শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! তুমিই একমাত্র গতি, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি।

ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড (শালগ্রাম) কে স্নান করাইতে করাইতে হিন্দু মন্ত্র-পাঠ করেন,—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু নাভির ঊর্দ্ধে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ।

জড় প্রতিমার নিকট মস্তক অবনত করিয়া হিন্দু প্রণাম করেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যে দেবতা সর্ব্বভূতের মধ্যে চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল মন্ত্র দ্বারা কি সেই জড় মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তরখণ্ড বা প্রতিমাকেই পূজা করা হয়, না অন্য কাহাকেও তাহাতে অধিষ্ঠিত জানিয়া তাঁহার পূজা করা হয়? অবশ্য একথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, যে সকল ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র দ্বারা পূজার বিধান করিয়াছিলেন,

অথবা যাঁহারা ইহার দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা এত দূর মূর্খ, বর্ব্বর, যে সামান্য মৃত্তিকাখণ্ডকে জগৎ-কারণ ঈশ্বর জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন, প্রস্তর খণ্ডকে "অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্র" সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিবেন, অথবা কাঠ-খড়যুক্ত প্রতিমাকে চৈতন্য-পদার্থ জ্ঞানে তাহার নমস্কার করিবেন।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা ও নিরাকারবাদীর জড়বস্তুর সাহায্যে ঈশ্বরকে শুষ্ক ধন্যবাদ দেওয়া, এই উভয়ে কতদূর প্রভেদ, তাহা ইতি-পূর্ব্বে পদ্মপুষ্প ও রমণী-মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মজ্ঞান।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, জড়জগতে আমাদের যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা সাকার। এখন আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কি জ্ঞান হয়, দেখা যাউক।

মনের জ্ঞান সাকার।

জড়জগতের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞানের ন্যায়, আমাদের মন (mind) ও মানসিক অবস্থাসকলের জ্ঞানও বাহ্যিক জগতের সাকারজ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও মন দ্বারা আমরা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান লাভ করি, তথাচ মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সাহায্য করে। যদিও মন আমাদের সকলেরই আছে, মন লইয়া আমরা সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতেছি, কিন্তু "মন কি ?" এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্য্যন্ত কয়জন লোকে দিতে পারিয়াছে?

প্রথমতঃ মন যখন বাহ্যজগতের সংস্পর্শে না আসে, আমাদের তাহার তখনকার অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে আমরা যখন মনের কিছু কিছু অবস্থা জানিতে আরম্ভ করি, তখন সে আমাদিগকে তাহার আদি ও অকৃত্রিম অবস্থা জানিতে দেয় না। তখন কেবল, সে বাহ্য-জগতের যে সকল চিত্র (image) সংগ্রহ করিয়া নিজে সজ্জিত হইয়াছে, দেশ (space) ও কাল (time) রূপ পটের উপর ইন্দ্রিয়রূপ তুলিকা দ্বারা বাহ্য-জগতের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে, আমাদিগকে তাহাই দেখিতে দেয়। তদ্ভিন্ন তাহার স্বরূপ অবস্থা আমাদিগকে কখনও দেখিতে দেয় না, তুমি সহস্রবার মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা (introspection) করনা কেন, কোন ক্রমেই মনের স্বরূপ জানিতে পারিবেনা। * তুমি বাহিরে দেখিতেছ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আবার ভিতরেও দেখিতেছ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের পূর্ব্ব সঞ্চিত চিত্র। এই সকল রূপ-রসাদির চিত্রের তলে, তোমার মন ঢাকা পড়িয়াছে, তুমি কিছুতেই তাহা খুঁজিয়া পাইতেছ না। তুমি মনকে জানিবার জন্ত চিন্তা করিতেছ, কিন্তু তোমার চিন্তার (thinking) অর্থ কি? না, বহির্জ্জগতের চিত্র সকলকে নূতন করিয়া সাজান। ("thinking means sorting and arranging the images of the external world"—*Sully.*) সুতরাং মনকে জানিতে গিয়া তুমি কেবল বহির্জ্জগতের প্রতিবিম্ব সকল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছ। মনের স্বরূপ কি তাহা তোমার জানিবার কোন

* অবশ্য "অধ্যাত্মযোগ"দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানা যায়। চতুর্থ অধ্যায় দেখ।

উপায় নাই। তবে মন সম্বন্ধে কি আমাদের কোনই জ্ঞান হয় না? হয়। যেমন বায়ুসংস্পর্শে স্থিরজলরাশির উপর বুদ্বুদাদিবিকার উত্থিত হয়, অথবা সৌরকর-স্পর্শে জলবিন্দুর উপর নানাবর্ণের চিত্রসকল শোভা পায়, সেইরূপ বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে মনের (আত্মার) উপর নানাবিধ বৃত্তি বা ভাবের (phenomena) স্ফুরণ হইয়া থাকে। আমরা কেবল সেই সকল বৃত্তি বা ভাব জানিতে পারি, যথা,—কল্পনা, বিচার, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা, স্নেহ, দয়া, প্রতিজ্ঞা, কামনা, চিত্ত-সংযম ইত্যাদি। ইয়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই সকল মানসিক ভাব বা গুণ (attributes)কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা,—(১)জ্ঞান (thought or knowledge), (২) অনুভব (feeling) ও (৩) ইচ্ছা (willing)। এখন আমাদের এই সকল মানসিক ভাবের জ্ঞান কিরূপ, তাহা দেখা যাউক।

---

(১) জ্ঞান সাকারমূলক।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জ্ঞানের চারিটী অর্থ দেখিয়াছি ; যথা জ্ঞাতব্য বিষয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞান লাভের ক্রিয়া ও ব্রহ্ম। আমরা আরও দেখিতেছি, জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সাকার পদার্থ, জ্ঞানের ক্রিয়া সাকারমূলক ; কেবল ব্রহ্ম নিরাকার। এস্থলে আমরা জ্ঞানের ক্রিয়া কি, তাহাই একটু বিশদরূপে আলোচনা করিব।

জ্ঞান (knowledge or thought) কাহাকে বলে ? না, যে প্রণালী দ্বারা আমরা বহির্জ্জগতের বস্তু সকল ইন্দ্রিয়

সাহায্যে আত্মসাৎ (assimilate) করি। সে প্রণালী এই,— বিষয়গ্রহণ (sensation), কল্পনা (imagination), বিচার (Judgment), স্মরণ (memory) ইত্যাদি। মন, ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে রূপ-রসাদি বিষয়গ্রহণ করে, তদনন্তর মনে সেই সকল বিষয়ের চিত্র বা প্রতিবিম্ব (image) ভাসিতে থাকে, সেই সকল প্রতিবিম্ব স্মৃতিশক্তি ও বিচারশক্তি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। চক্ষু দ্বারা আমি একটী পুষ্প দেখিলাম; মনে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িল; তখন মন স্মরণ করিতে লাগিল, এরূপ ফুল আর কখনও দেখিয়াছি কি না, এবং পূর্ব্বসঞ্চিত ফুলের চিত্র সকল ঘাঁটিতে লাগিল; ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এইরূপ একটী ফুলের চিত্র পাওয়া গেল; তাহার সঙ্গে বিচারশক্তি দ্বারা এই ফুলটীর চিত্রের মিল করিয়া মন সিদ্ধান্ত করিল—এটা গোলাপ ফুল। অবশ্য এতগুলি কার্য্য নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হইল।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞান বলিলে যতগুলি কার্য্য বুঝা যায়, তাহার সকল গুলিই রূপ-রসাদি বিষয় ভিন্ন হইতে পারে না। জগৎ হইতে সাকার রূপ-রসাদির চিত্র সংগ্রহ করিলে, তবে জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানের ক্রিয়া সকল রূপ-রসাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তাহার পরবর্ত্তী। অতএব জ্ঞান সাকারমূলক।* এস্থলে একটী কথা স্মরণ কর

* Introspection (ধ্যান) দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাও বহির্জ্জগৎ হইতে সংগৃহীত চিত্র সকলের সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। আর সে সকল চিত্রকে মন হইতে যদি বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে মনে কোনই চিন্তা হইতে পারে না, মন নিস্পন্দ, নির্ব্বিষয় হয়, মনের কোন ক্রিয়া থাকে না; অথবা শরীরের মধ্যস্থিত ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া হইতে এক প্রকার অনুভূতি হয়, যেমন শীতগ্রীষ্মানুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শরীরের কোন স্থানে বেদনা ইত্যাদি। এই সকল শারীরিক অনুভূতি ("muscular feel-

ইয়া দেওয়া আবশ্যক। "ভাবনা" ও "অনুভব" যে দুইটী পৃথক বস্তু, নগেন্দ্র বাবু তাহা অনুধাবন করেন নাই। দুঃখের ভাবনা (thinking) ও দুঃখের অনুভূতি (feeling) এক পদার্থ নহে। একটী লোক তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদে দুঃখ অনুভব করিতেছে, আর আমি তাহার সেই দুঃখ দেখিতেছি। এস্থলে পুত্রশোকে তাহার হৃদয়ে এক তুমুল বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে; সে অন্তঃকরণে সহস্রবৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছে, শরীর বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আছে, কোনই সুখদুঃখ বোধ নাই, নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুপতন হইতেছে। আমি একজন তাহার নিঃসম্পর্কীয় দর্শক, আমার কিন্তু সেরূপ কোনই অনুভূতি বা চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হয় নাই, অথচ আমি তাহার দুঃখ প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমি তাহার দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতেছি। সুতরাং আমার "দুঃখ" সম্বন্ধে দুঃখিতের অবস্থা দর্শনে "ভাবনা" হইলেও, আমার দুঃখের কোন "অনুভূতি" হইল না। অতএব "ভাবনা" ও "অনুভূতি" এক পদার্থ নহে। নগেন্দ্র বাবু কিন্তু উহাদিগকে এক বলিয়াই বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই নিরাকার ভাবিতে পারেন, অজ্ঞান লোক পারে না। ইহা কি প্রকৃত কথা? সুখ,

---

ings"—*Bain*) অবশ্য শরীরকে অবলম্বন করিয়া হয়, এবং তাহাদের জ্ঞান শরীরের কোন বিশেষ স্থান অবলম্বনে হয়; ইহাকে localisation বলে। শরীরকে দার্শনিক পণ্ডিতগণ মনের সহিত তুলনায়,বাহ্যজগতের অন্তর্গত বলেন, ("our own body is a part of our objectexperience"—*Bain*) সুতরাং এই সকলশারীরিক অনুভূতি সাকার বাহ্য-জগতের অবলম্বনে হয়।

দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব কি সকল মনুষ্যই অনুভব করে না? কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি হর্ষ, শোক, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না? *

সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নিরাকার পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাকে যখন তাহা ভাবিতে হয়, তাহা চিন্তা করিতে (think) হয়, তখন আমি সাকার চিন্তা করিয়া থাকি। কারণ চিন্তা (thinking) মাত্রেই বহির্জ্জগতের চিত্র সকলকে মনে সজ্জিত করা। উল্লিখিত শোকার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া আমার মনে দুঃখের একটী বাহিরের চিত্র খোদিত হইয়া রহিয়াছে, যথা তাহার ভূমিতে লুণ্ঠন, অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন, শিরে করাঘাত, হাহাকার ধ্বনি ইত্যাদি। যখনই আমি দুঃখের বিষয় চিন্তা করিব, তখনই আমার সেই সাকার চিত্রটী মনে পড়িবে। † এই রূপে আমার দুঃখের চিন্তা ও জ্ঞান সাকার হইবে।

এইরূপ দুঃখের ন্যায় "দয়া" একটী বৃত্তি। "দয়া" পদার্থ নিরাকার হইতে পারে, কিন্তু আমার দয়ার জ্ঞান সাকার না নিরাকার? আমি যখন দয়ার বিষয় চিন্তা করি, তখন আমার মনে কি উদিত হয়? অবশ্য দয়ার কোন সাকার চিত্র। পূর্ব্বে বহির্জ্জগৎ হইতে আমি যে সকল দয়ার কার্য্য বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, "দয়া" বলিলে আমার

---

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রথমখণ্ড ২য় সংস্করণ ১১১ পৃষ্ঠা।

† "For a knowledge of the feeling of others, we must trust to external signs, interpreted by our own consciousness",—*Bain's Mental and Moral Science, p. 221.*

মনে তাহার একটী চিত্র আসিয়া পড়ে। যেমন রাম ভিক্ষুককে দেখিয়া একটী পয়সা দিতেছে; রামের সেই ভিক্ষুকের কাতরতা দেখিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে ইত্যাদি। এই সকল দয়ার চিত্র অবশ্যই সাকার। সুতরাং দয়ার বিষয় চিন্তা করিলে, আমাকে সাকার চিন্তা করিতে হয়। আমার দয়ার জ্ঞান, সাকার দয়ার কার্য্যের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিল। এইরূপে প্রত্যেক মানসিক বৃত্তি বা অবস্থার জ্ঞানই সাকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ও তাহার পরবর্ত্তী।

(২) অনুভূতি সাকারমূলক।

এখন আমরা দেখিলাম, দুঃখ দয়া প্রভৃতি অনুভূতি (feeling or emotion)সম্বন্ধীয় জ্ঞান (knowledge) আমাদের সাকার। যখন আমরা দুঃখ, দয়া প্রভৃতি অনুভূতিকে চিন্তা করি, তখন আমরা সাকার চিন্তা করি। কিন্তু আমাদের দুঃখ, দয়া প্রভৃতির অনুভূতি (feeling) কি পদার্থ—সাকার না নিরাকার? অন্যে দুঃখ অনুভব করিতেছে, কিংবা দয়া অনুভব করিতেছে, আর আমি তাহা দেখিতেছি, তাহা ভাবিতেছি। এস্থলে আমার মনে দুঃখ ও দয়ার জ্ঞান সাকার হইল; কিন্তু আমি নিজে যখন দুঃখ অনুভব করি, কিংবা দয়া অনুভব করি, তখন আমার মনে কিরূপ ভাব হয়? সাকার ভাব না নিরাকার ভাব? অর্থাৎ দুঃখ, দয়া প্রভৃতি ভাব সকলের জ্ঞান সাকার, কিন্তু তাহারা নিজে সাকার না নিরাকার?

পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই—অনুভূতি (feeling or emotion)মাত্রেই কোন ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় বা শারী-

রিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবলম্বনেউৎপন্ন হয়। আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের (sensation)সহিত অনুভূতির এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অধ্যাপক বেন (Bain) ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও অনুভূতি এক পদার্থ বলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, সাকার বহির্জ্জগৎ ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (sensation) জন্মিতে পারে না। আবার সাকার শরীর ভিন্ন ও শারীরিক অনুভূতি (muscular feeling) হইতে পারে না। সুতরাং সাকার বস্তুর সহিত অনুভূতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; অন্তরে কিংবা বাহিরে সাকার বস্তুর সহিত মিলিত ভাবে অনুভূতির স্ফুরণ হয়, অনুভূতির সহিত সাকার বস্তুর জ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ। রাম মিথ্যাকথা বলায় আমার তাহার উপর "রাগ" হইয়াছে। এই রাগের সহিত হয় রামের প্রতিমূর্ত্তি নতুবা তাহার মিথ্যা কথার বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি। রামকে তুমি আমার নিকট হইতে ডাকিয়া লইয়া যাও, কিংবা আমার মন অন্য বিষয়ের দিকে আকর্ষণ কর, অমনি সে রাগ থামিয়া যাইবে। একটী ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া আমার মনে "দয়ার" সঞ্চার হইয়াছে; যতক্ষণ আমি সেই ভিক্ষুকের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে দয়া আছে। সে যদি এখনই আমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, ও আমার মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তখনই সে দয়া আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে। বহু দিন পরে একটী বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে "সুখ" হইয়াছে। সেই বন্ধু আমার নিকট যতদিন থাকিবে, আমি যতক্ষণ তাহার বিষয় ভাবিব, আমার সুখও ততদিন থাকিবে। সে যখন চলিয়া যাইবে, তখন আমার সুখও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া

যাইবে। আমি আমার সে বন্ধুকে "ভালবাসি" কেন? অনেক দিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে অবস্থিতি করাতে ও তাহার মূর্ত্তি * ও কার্য্যকলাপ আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হওয়াতে আমার তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে। যদি আমি তাহার কথা সর্ব্বদা চিন্তা না করিতাম, কিংবা তাহার সংসর্গে না থাকিতাম, তবে সেরূপ ভালবাসা জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। শিশু মাতাকে বেশী ভালবাসে কেন? না, মাতার চিত্র,

* মূর্ত্তি দেখার উপর ভালবাসা বা প্রেম নির্ভর করে, এই মত খণ্ডন করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু একটা অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। "মূর্ত্তি না দেখিলে যে প্রেম প্রভৃতি ভাবের উদ্ভব হয় না, একথা সকল স্থানে স্বীকার করিতে পারি না। ঈশা বলিয়াছেন, 'অপর মনুষ্যকে আত্মবৎ প্রীতি কর।' অন্য কোন কোন সাধু বলিয়াছেন, 'অন্য মনুষ্যকে আপনার অপেক্ষা অধিক প্রীতি কর।' অন্যকে আত্মবৎ কিংবা আপনার অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, এমন মহাজন জগতে কয়জন আছেন? সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই অন্যের অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভালবাসে। এস্থলে দেখুন, যদি মূর্ত্তিদর্শনের উপর প্রেম নির্ভর করিত, তাহা হইলে সাধারণতঃ আপনার অপেক্ষা অন্যের প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই অধিক হইত। আমরা অন্যের মূর্ত্তি যেমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, নিজের মূর্ত্তি কি সেইরূপ দেখিতে পাই? মধ্যে মধ্যে দর্পণে দেখি সত্য; কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন এবং চক্ষুঃ দ্বারা প্রতিমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দর্শন, এ উভয়ের কি তারতম্য নাই? দর্পণে মুখ দেখি, আবার তাহা ভুলিয়া যাই" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, আমার মূর্ত্তি বলিলে কি কেবল মুখই বুঝায়, না শরীরের অন্যান্য অংশও বুঝায়? দর্পণ ভিন্ন মুখ দেখিনা সত্য, দর্পণে মুখ দেখিয়া আবার ভুলিয়া যাই সত্য, কিন্তু আমার মস্তকের নিম্নে শরীরের অবশিষ্ট অংশও আমার মূর্ত্তি, এবং তাহা আমি সর্ব্বদাই দেখিতেছি; আর আমার আত্মপ্রীতি আমার নিজের মূর্ত্তি দেখার উপর নির্ভর করে না, তাহা আমার সহজাত।

মাতার ব্যবহার, মাতার কার্য্যকলাপ সে যেরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পায়, আর কাহারও ততদূর পায় না। আমাদের জন্মভূমির প্রতি কিংবা গৃহের প্রতি এতদূর মমতা কেন? না, জন্মাবধি সেই স্থানের চিত্র সকল (association) আমাদের মনে খোদিত হইয়া আছে। অধিক দৃষ্টান্তের আর আবশ্যক নাই, এইরূপে দেখা গেল, ক্রোধ, দয়া, সুখ, ভালবাসা প্রত্যেক অনুভূতিই এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান-মূলক, বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে গাঁথা। কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন অনুভূতি থাকিতে পারে না। * এই সকল বস্তু বা বিষয়ের চিত্র অবশ্য সাকার; সুতরাং অনুভূতিও সাকার। অতএব নগেন্দ্র বাবু যে লিখিয়াছেন,—

"সুখ, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব কি সকল মনুষ্যই অনুভব করে না? কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি হর্ষ, শোক, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতি অনুভব করে না? নিরাকার কাঁদায়, নিরাকার হাসায়, নিরাকারে বলায়, নিরাকারে চলায়, নিরাকারে ভবসংসারে বিঘূর্ণিত করে; অথচ বল নিরাকারকে অনুভব করা যায় না?"

ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সুখ, দুঃখ, শোক, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতি নিরাকার নহে, তাহারা সাকারমূলক—এমন কি নিরাকার তাহাদের যে জ্ঞান, তাহাও সাকার।

---

* "Our emotions are more or less associated with objects, circumstances and occasions, and spring up when these are present either in reality, or in idea; affection is awakened at the sight or thought of what is lovely or endeared to us; fear is apt to arise when perils are brought to view."

Bain's "Mental and Moral Science" p. 344.

(৩) ইচ্ছাশক্তি সাকারমূলক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের ইচ্ছা সুখ ও দুঃখের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তদ্ভিন্ন ইচ্ছাশক্তির কার্য্য হইতে পারে না। (Bain) বলেন,—

"Will or volition comprises all actions of human beings in so far as impelled or guided by feelings. * * * Actions not prompted by feelings are not voluntary".—*Mental and Moral Science* p. 2.

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, সাকার বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের অবলম্বন ভিন্ন অনুভূতি (feeling) উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব আমাদের ইচ্ছাশক্তিও সাকারমূলক ইহা প্রমাণিত হইল।

এইরূপে আমরা মানসিক ভাব বা বৃত্তি সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, তাহারা সাকারমূলক অথবা তাহাদের জ্ঞান সাকার বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ও সাকার জ্ঞানের পরবর্ত্তী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন কি আমরা জানি না, আমরা জানি কেবল মনের বৃত্তি সকলকে, সুতরাং মন সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা এই সকল বৃত্তির জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। এই সকল বৃত্তির জ্ঞান সাকার বলিয়া আমাদের মনের জ্ঞানও সাকার। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার।

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্যদর্শনের মত আলোচনা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, আমাদের হিন্দুদর্শনের মতে "মন" সাকার। তাহা পাশ্চাত্য মন (mind) বা আত্মার বৃত্তিবিশেষ। হিন্দু দর্শন মতে, সুখ, দুঃখ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি বৃত্তি সকল এক

মন বা চিত্তের রূপান্তর মাত্র। সুতরাং মন সূক্ষ্ম জড় পদার্থ ও সাকার বলিয়া, এই সকল বৃত্তিও সূক্ষ্ম জড় ও সাকার। মনের যদি photograph তোলা হইয়া থাকে, তবে এই সকল বৃত্তিরও তোলা যাইতে পারে। বাস্তবিক সে দিন খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম, ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত Dr. Baraduc, সম্প্রতি চিন্তিত বিষয়ের photograph তুলিয়াছেন। Daily Graphic নামক সংবাদ পত্রের কোন লেখক সেই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"The important and startling point is that sincere and profoundly convinced *Savants* agree that human thought or Psychical force—the name does not matter—put in presence of a photographic plate can imprint on it the trace of its passage. Is the soul to be laid bare experimentally?"

(Vide Reprint of "Photographing thought" in the Amrita Bazar Patrika of the 8th August, 1896).

অর্থাৎ ইয়ুরোপের বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অকপট রূপে এক বাক্যে বিশ্বাস করেন যে, আমরা মনে যাহা চিন্তা করি, বাহিরে তাহার ফটোগ্রাফ্ তোলা যায়।

আগে কি আর পরে কি ?

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে, জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ মানসিক ক্রিয়াতে রূপরসাদি সাকার বিষয় না হইলেও যেমন চলে না, মন (mind) না হইলেও সেরূপ চলে না। মন যখন নিরাকার, তখন মানসিক বৃত্তি সকল নিরাকারের পরবর্ত্তী ও নিরাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলনা কেন ?

এ যুক্তির সারবত্তা আমি স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে মান-

সিক ক্রিয়াতে, নিরাকার মনের যেরূপ আবশ্যক, সাকার বিষয় এবং ইন্দ্রিয়েরও সেইরূপই আবশ্যক। ইহার কোনটা বাদ দিলে মানসিক ক্রিয়া হইতে পারে না। সুতরাং ইহার একটা, অন্যটার অগ্রবর্ত্তী, কিংবা একটা অন্যটার উপর নির্ভর করে, কিংবা একটার উপর অন্যটা প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলা অযৌক্তিক। মনের ক্রিয়াতে এই তিনটীরই সমান আবশ্যকতা। তবে নগেন্দ্র বাবু যখন কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ও সাকার বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে একেবারেই উড়াইয়া দিতে চাহেন, সেই জন্যই কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে এ সম্বন্ধে বিচার করা গেল। জ্ঞান সাকার কিংবা জ্ঞান নিরাকার এ প্রশ্নের মীমাংসায়ও বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের মূল বিচার্য্য বিষয় হইতেছে, "জ্ঞানময় ঈশ্বরকে" ভাবিতে হইলে আমরা সাকার চিন্তা করি, না নিরাকার চিন্তা করি? ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান (knowledge) ও চিন্তা (thinking) সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, সাকার রূপ, রসাদি ভিন্ন আমরা কিছু জানিতে পারি না, কিংবা চিন্তা করিতে পারি না। জ্ঞান অর্থে জগতের চিত্র সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করা; এবং চিন্তা অর্থে সেই সকল চিত্রকে নূতন ভাবে সজ্জিত করা। সুতরাং "ঈশ্বরকে জ্ঞানময়" বলিয়া চিন্তা করিতে কিংবা জানিতে হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে জগতের চিত্র সকল মনে আলোচনা করিতে হইবে, জগতে তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য যদি আমার কিছু জানা থাকে, তাহাই ভাবিতে হইবে। যদি আমার তাহা কিছু জানা না থাকে, তবে আমাকে শূন্য চিন্তা করিতে হইবে। বহির্জ্জগতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশক ঘটনা কিংবা পদার্থ সকল অব-

ভূত সাকার। সুতরাং জ্ঞানময় ঈশ্বরের চিন্তা, সাকার চিন্তা। অতএব আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার।

আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে সমুপস্থিত বালকবৃন্দকে আচার্য্য উপদেশ দিতেছেন—"তোমরা ভাব, ঈশ্বর দয়াময়। এই দেখ, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রত্যহ আহার দিতেছেন, আমাদিগের পীড়া হইলে, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন, আমরা যখন শিশু ছিলাম, তিনি দয়া করিয়া মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ দিয়াছিলেন ইত্যাদি।" বালকদিগের মধ্যে যাহার কল্পনা শক্তি ততদূর নাই, সে "দয়াময় ঈশ্বর" ভাবিতে গিয়া কেবল শূন্য দেখিতে লাগিল; কেহবা দ-য়া-ম-য়-ঈ-শ্ব-র এই কয়েকটা অক্ষর চিন্তা করিতে লাগিল; একটী ভোজন-প্রিয় বালক "আহারযোগানের" কথা শুনিয়া লুচি কচুরীর কথা ভাবিতে লাগিল। অন্য একটী বালক পুস্তকে পড়িয়াছিল, ভিক্ষুককে দানকরা দয়ার কার্য্য ও সে একদিন একজন ভিক্ষুককে একটা পয়সা দিয়াছিল। "ঈশ্বর দয়াময়" ভাবিতে গিয়া সে সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করিল; কিন্তু সে যেমন ভিক্ষুককে পয়সা দিয়াছিল, কৈ ঈশ্বর তো সেরূপ তাহাকে কিছু দেন না? সে ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইল না। তাহাদের মধ্যে যে চিন্তাশীল, সে আহারদানের কথাতে তাহার মাতাকে স্মরণ করিল, কারণ তাহার মাতা প্রত্যহ তাহাকে খাইতে দেন; পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তারকে ভাবিতে লাগিল, কারণ তাহার যখন কলেরা হইয়াছিল, তখন ডাক্তার তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন; এবং মাতৃস্তন্যের কথা শুনিয়া তাহার ছোটভাই খোকা কি রকম তাহার মাতার স্তন্যপান করে, ইহাই ভাবিতে

লাগিল, কিন্তু এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ইহাতে ঈশ্বরের কি কার্য্য, সে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যদি কোন জ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকেন, তবে আচার্য্যকথিত প্রত্যেক কার্য্য কিংবা ঘটনায় তিনি ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন—যেমন প্রতিদিন আমাদের আহারকরার চিত্র ভাবিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও দয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কোন একটা পীড়িত লোকের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার সহিত ঈশ্বরের দয়া ভাবিতে লাগিলেন, এবং একটা স্তন্যপায়ীশিশুর ও তাহার জননীর চিত্র মনে ভাবিয়া,তাহাতে ঈশ্বরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরের দয়ার জ্ঞান এই সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, বিশেষ বিশেষ বাহ্যজগতের চিত্র অবলম্বনে হইল। এই সকল ব্যক্তি, ঘটনা ও চিত্র সাকার বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরের দয়ার চিন্তাও সাকার হইল। সুতরাং ঈশ্বর "দয়াময়" বলিয়া যে ঈশ্বর চিন্তা, তাহাও সাকার হইল। এই-রূপে, নগেন্দ্র বাবু, "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী-সতীর পবিত্রপ্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা" দর্শনের কথা যে বলেন, তাহাও সাকারপদার্থ দর্শন, সাকার চিন্তা। কারণ আমরা শিশুর মুখ চিন্তা না করিয়া সরলতা চিন্তা করিতে পারি না; একটী স্নেহময়ী মাতার মূর্ত্তি চিন্তা না করিয়া আমরা তাঁহার স্নেহের কথা ভাবিতে পারি না; একটী সতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত মনে না করিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমের কথা মনে করিতে পারি না; একজন ভক্তের ছবি মনে না

করিয়া তাঁহার "ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রী" ভাবিতে পারি না; এবং কোন কোন বিশেষ সাধু ব্যক্তির মূর্ত্তি মনে না করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা ভাবিতে পারি না। এই সকল মূর্ত্তি অবশ্যই সাকার, সুতরাং সাকারের অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তাও সাকার চিন্তা। সুতরাং মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান সাকার।

নিরাকারের জ্ঞান যে প্রকৃত পক্ষে সাকারের জ্ঞান, তাহা নগেন্দ্র বাবু নিজেও স্বীকার করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাকারের কোন জ্ঞান নাই। একি কথা? নিরাকারের জ্ঞান অভাবাত্মক জ্ঞান (negative idea) নিশ্চয়ই আছে। সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারের অভাবাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে। নিরাকার কি? না, যাহা সাকার নহে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা নিরাকার ভাবি, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। নিরাকার আবার ভাবিব কি? আকার নাই, আকার নাই এই কি একটা ভাবিবার বিষয়? হাত, পা, নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ভাবিলে ঈশ্বরকে ভাবা হয় না। আবার হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, নাসিকা নাই, এরূপ ভাবিলেও ঈশ্বরের চিন্তা হয় না। তবে কি ভাবিব? শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়, অনন্ত পরমেশ্বরকেই ভাবিব।" *

ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে দেখান হইয়াছে, "দয়াময়" ঈশ্বর ভাবিতে হইলে, হয় শূন্য ভাবিবে, না হয় কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ঘটনা ভাবিতে

* ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, ১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন।

হইবে। "দয়াময় ঈশ্বর"কে ভাবিলে, কেবল হাত, পা, নাক, মুখ ও ভাবা হয় না, আবার হাত-পা-নাক-মুখ-শূন্য ঈশ্বরকে ও ভাবা হয় না। সেই হাত-পা-নাক-মুখের মধ্যে, হাত-পা-নাক-মুখের সহিত মিলিত ভাবে, সেই হাত-পা-নাক-মুখের সহিত অভেদভাবে, সেই ঈশ্বরকে ভাবিতে হয়। সেইরূপ "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, পবিত্রতাময় ঈশ্বর"কে ভাবিতে হইলেও কোন কোন বিশেষ বিশেষ হাত-পা-নাক-মুখ-বিশিষ্ট মূর্ত্তির সহিত মিলিতভাবে, অভেদভাবে ভাবিতে হইবে।

জগতে ঈশ্বরের সাকার রূপ।

এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে, কার্য্যের সহিত কর্ত্তাকে ভাবিতে গেলে, কার্য্যের মধ্যে, কার্য্যের সহিত মিলিত ভাবে, অভেদভাবে কর্ত্তাকে ভাবিব কেন? ঈশ্বরের কার্য্য মনুষ্য, সেই মনুষ্যের ঈশ্বরকে ভাবিতে হইলে, সেই মনুষ্যের মধ্যে, মনুষ্যের সহিত অভেদে, মিলিতভাবে ঈশ্বরকে ভাবিব কেন? সেই মনুষ্যের হাত, পা, নাক, কাণই বা ঈশ্বরে আরোপ করিব কেন? একজন মনুষ্য একটী ঘড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে; সে সেই ঘড়ীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা; এখন তাহার কার্য্যের সহিত তাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কখনও বলি না যে, ঐ ঘড়ীর যে স্প্রীং, চক্র, টিক্ টিক্ শব্দ, তাহা তাহার কর্ত্তা মনুষ্যের। বিলাত হইতে একজন সুপ্রসিদ্ধ কারিগর মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের একটী সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে;

এই প্রস্তর-মূর্ত্তি সেই কারিগরের কার্য্য, সেই প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলে সেই কারিগরের শিল্পনৈপুণ্য মনে পড়ে, কিন্তু আমরা সেই কারিগরকে কখনও সেই মূর্ত্তির সহিত মিলিতভাবে দেখি না; সে সেই লণ্ডনেই আছে, আর এই মূর্ত্তি আছে কলিকাতা হ্যারিসন্ রোডে; এই মূর্ত্তির হাত, পা, নাক, মুখ সেই কারিগরের হাত, পা, নাক, মুখ নহে। সেই কারিগরের মূর্ত্তি এই কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং ঈশ্বরের সাকার কার্য্য চিন্তা করিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরকে সাকার চিন্তা করি কেন?

ইহার উত্তর সহজ। মানুষ-কর্ত্তা তাহার কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-কর্ত্তা তাহা পারেন না। তিনি যে তাঁহার কার্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।

("যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ")।

এই সৃষ্ট জগৎ তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহার ক্রিয়াতে ক্রিয়াবান্। তাঁহার সহিত স্বতন্ত্রভাবে জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বজগৎ তাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে ও তাঁহাকে আমাদের জ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত করিয়াছে। তিনি বিশ্বময়, সর্ব্বময়, বিশ্বরূপ, সর্ব্বরূপ। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমেলোকা ইমে
বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" বৃহদারণ্যক।

এই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, লোকসমূহ, বেদসমূহ, সর্ব্বভূত এসমস্তই পরমাত্মা।"

এইজন্য জ্ঞানিগণ তাঁহাকে বিশ্বমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। সেই "বিশ্বমূর্ত্তি" দেখিয়া অর্জ্জুন একদিন স্তব করিয়াছিলেন,—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

গীতা ১১।৪০

হে সর্ব্ব! তোমার অগ্রে, পৃষ্ঠে, তোমার সর্ব্বত্র নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য, তুমি অমিতবিক্রম, তুমি সকল ব্যাপিয়া আছ, সেইজন্য তুমি সর্ব্ব।

ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, এ বিষয়ে কোন ধর্ম্মের সহিতই আমাদের মতভেদ নাই। নগেন্দ্র বাবুও বলিয়াছেন,—

"শক্তি আত্মার গুণ হইলে, যেখানেই শক্তি সেইখানেই আত্মা। বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র শক্তি বিদ্যমান বলিয়া আমরা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করি, সুতরাং বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র আত্মা।"

'বহির্জ্জগতে শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না, উহা ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় নহে। অথচ আমরা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করি যে, বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র শক্তি কার্য্য করিতেছে। অন্তর্জ্জগতে শক্তি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। উহা আত্মার গুণ। সুতরাং যেখানেই শক্তি, সেখানেই আত্মা। বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতরাং বহির্জ্জগতে সর্ব্বত্র আত্মা রহিয়াছেন।

"দয়া প্রভৃতি যেমন আত্মার গুণ, শক্তিও সেইরূপ আত্মার গুণ। দয়া, প্রেম প্রভৃতি যেমন জ্ঞান হইতে অভিন্ন, শক্তিও সেইরূপ জ্ঞান হইতে অভিন্ন। সুতরাং যেখানেই শক্তি আছেন বলিয়া মনে করিব, সেখানেই উহা জ্ঞানের সহযোগে স্থিতি করিতেছে, এরূপ মনে করিতেই হইবে।

"এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি—"আদ্যাশক্তি ভগবতী" জগতের প্রাণরূপে, "জল স্থল শূন্যে" "সমান ভাবে" বিরাজমান। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান

সমভাবে দেখিতেছেন,—ইনি ত্রিনেত্রা দশদিক রক্ষা করিতেছেন,—ইনি দশ ভুজা। ইনি চিরদিন জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে সবলতা, কদর্য্যতার পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্য, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিবর্ত্তে বুদ্ধিচাতুর্য্য, দুর্নীতির পরিবর্ত্তে সুনীতি আনয়ন করিয়া সংসারকে উন্নতির ও মঙ্গলের পথে ধাবিত করিতেছেন, ইনি চিরদিন মহা প্রভাবে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন ;—ইনি সিংহবাহিনী অসুর-নাশিনী। ইনি জ্ঞানদাত্রী, ধনদাত্রী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী,—ইনি স্বয়ং সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণপতি। এই নিখিল ভুবনব্যাপিনী, অসীম অনন্ত-রূপিনী, রূপ-বিবর্জ্জিতা, সর্ব্বরূপ-প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা, দশভুজা, অসুর-নাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মহাদেবীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।"*

অতএব আমরা দেখিলাম, এই জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য হইলেও তিনি ইহার অণুতে অণুতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। মনুষ্যের আত্মা যেমন মনুষ্য-শরীরের অবলম্বনে কার্য্য করিয়া থাকে ও তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, বিশ্ব-আত্মাও সেইরূপ জগতের সাহায্যে, জগতের মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই জন্য এই জগৎ তাঁহার শরীর, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, মস্তক সকলই তাঁহার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, মস্তক ; কারণ, তিনি এক অখণ্ড আত্মা-রূপে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া এই সকল হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, মস্তকের সাহায্যে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। এই জন্য

* "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ১ম খণ্ড, "মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কিনা ?' প্রবন্ধ দেখ।

শ্রুতিতে তাঁহাকে, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" বলা হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহাকে—

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখং
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ"।

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ। বাস্তবিক ইহা উপমা নহে, ঈশ্বরের এই বিশ্বব্যাপী "অনন্তবাহূদরবক্ত্র"—বিশিষ্ট বিরাট মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি একথা বলিয়াছেন। এই রূপে এই জড়জগৎ তাঁহার সমষ্টি মূর্ত্তি বলিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার ব্যষ্টিমূর্ত্তি। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাঁহার মূর্ত্তি; পৃথিবীতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, গাছ, পাথর, মৃত্তিকা সকলই তাঁহার মূর্ত্তি; * আবার সেই কাষ্ঠ, পাষাণ, তৃণ, মৃত্তিকা দ্বারা তাঁহার কোন বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয়, তাহাও তাঁহার মূর্ত্তি। সেই প্রতিমা তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, তাহার প্রতি অণুতে তিনি (নগেন্দ্র বাবুর কথিত) জ্ঞান, শক্তি, চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই প্রতিমা দ্বারা যে বিশেষ ভাব প্রকটিত হয়, তাহাও তাঁহারই ভাব। সেই প্রতিমায় অভিব্যক্ত ভাব যদি তাঁহার ভাব হয়, সেই প্রতিমা দ্বারা প্রকাশিত মাতৃত্ব, দয়া যদি তাঁহার মাতৃত্ব, দয়া হয়, তবে প্রতিমার যে সকল হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু দ্বারা সেই ভাব পরিস্ফুট হয়, সে সকলও তাঁহার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু। সুতরাং প্রতিমা তাঁহার মূর্ত্তি। অতএব

* শিবের অষ্টমূর্ত্তির কথা বোধ হয় সকলেই জানেন,—ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, চন্দ্র, ও সূর্য্য। যাঁহারা প্রত্যহ শিব পূজা করেন, তাঁহাদিগকে এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়।

মনুষ্য কর্ত্তা তাহার কার্য্য-ঘড়ি হইতে পৃথক্ থাকিলেও, ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র নহেন, তাঁহার কার্য্য তাঁহার সত্তায়ই সত্তাবান্।

উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা।

বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা সাধন।* অবশ্য এতদ্ভিন্ন আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যেমন চিত্তের পবিত্রতালাভ, ঈশ্বরানন্দলাভ ইত্যাদি। কিন্তু সে সকল এই একাগ্রতা হইতেই হয়; সুতরাং উপাসনার মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা, গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তের পবিত্রতা ইত্যাদি। চিত্তের একাগ্রতার অর্থ কি? অবিচলিত চিত্তে কোন বিষয় চিন্তা বা ধ্যান করা। কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি চিত্তের আকর্ষণ জন্মে। সেই তীব্র আকর্ষণ বলে, মন অন্যদিকে ধাবিত না হইয়া, কেবল সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুতেই সংলগ্ন থাকে, তাহাকে কোন ক্রমে তাহা হইতে ফিরাণ যায় না। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা-চরিত্রে এই একাগ্রতার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অঙ্কিত করিয়াছেন। শকুন্তলা অতি তীব্র একাগ্রতার সহিত দুষ্মন্তের ধ্যানে নিমগ্না। ইতিমধ্যে কোপন-স্বভাব উগ্রতেজা দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। তিনি শকুন্তলার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তবুও শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমি অতিথি!" সে বজ্রনিনাদবৎ শব্দও

* "এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং, উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্র্যম্" বেদান্তসার।

শকুন্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না। তৎপরে যখন দুর্ব্বাসা নিজকে অবমানিত জ্ঞানে, সহস্রাশনিনির্ঘোষ-স্বরে শকুন্তলাকে শাপ প্রদান করিলেন, তখন সে শব্দ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল, তিনি চমকিত হইয়া সম্মুখে ক্রোধ-বিস্ফুরিতাধর, অগ্নিতেজে তেজস্বী মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, তাঁহার প্রতিও এইরূপ একাগ্রতা চাই। একাগ্রতা লাভের দুইটী উপায় আছে। তীব্র অনুভূতি (feeling) (যথা, প্রেম, বিদ্বেষ), ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা। যাহার প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয় ও নিমগ্ন থাকে। আবার কোন অনুভূতির উদ্রেক ব্যতি-রেকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারাও একাগ্রতা জন্মিতে পারে। আবার একথাও ঠিক, প্রেম স্বভাবতঃ না থাকিলে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারাও তাহা জন্মিতে পারে। আগে যাহার সহিত কখ-নও আলাপ পরিচয়ও ছিল না, কেবল পুনঃ পুনঃ তাহার সহিত সংসর্গ, তাহার বিষয় চিন্তা দ্বারা তাহার প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে। সুতরাং সাধকের পক্ষে যে পথেই যাওয়া হউক না কেন, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাঁহার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের প্রতি চিত্ত-সংযোগ করা আবশ্যক। ঈশ্বরের অনন্তভাব; কিন্তু তাহার মধ্যে কোন একটী ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্ত সংবদ্ধ করা আবশ্যক। একটীর পর একটী, তাহার পর আর একটী এইরূপ করিয়া তাঁহার অনন্তভাবের চিন্তা করিতে গেলে, তাহাতে চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে না, মন একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না।

কারণ তদ্বারা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা হইল না, অনেকগুলি বিষয় ক্রমে ক্রমে চিন্তা করা হইল। তাহাতে স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত সংযত হওয়া দূরে থাকুক, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ জন্য আরও চঞ্চল হয়। মনে কর, আমি ঈশ্বরকে "দয়াময়" বলিয়া ভাবিতেছি। দয়াময় বলিয়া ভাবার অর্থ, এই অনন্ত জগতে তাঁহার যে সকল দয়ার কার্য্য আছে, তাহাই একটীর পর আর একটী চিন্তা করা। অবশ্য "দ-য়া-ম-য়-ঈ-শ্ব-র" এই কয়েকটী অক্ষর ভাবিলে কিছু হইবে না। এখন এই অনন্ত বিশ্বে তাঁহার দয়ার অনন্ত কার্য্য রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে হইলে, আমার মন ক্রমাগত অনন্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে। যেমন, আমাদিগকে প্রত্যহ আহার দেওয়া তাঁহার একটী দয়ার কার্য্য, আমাদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করা তাঁহার একটী দয়ার কার্য্য (বিপদও আবার অনন্ত রকমের আছে), তিনি আমাদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ করেন, ইহা তাঁহার দয়ার কার্য্য ইত্যাদি। এখন ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ভাবিতে হইলে, তাঁহার এইরূপ প্রত্যেকটী দয়ার কার্য্য (অবশ্য, যতগুলি আমার জানা আছে) ক্রমাগত ভাবিতে হইবে ও প্রত্যেকটী দয়ার কার্য্যের সহিত এক-একটী স্থূলজগতের চিত্র আমার মনে ক্রমাগত উদিত হইবে। সুতরাং আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইবে। তাহাতে আমার চিত্তস্থৈর্য্য হওয়া দূরে থাকুক, আমার চিত্ত আরও চঞ্চল হইতে অভ্যস্ত হইবে। ইহার পরে আবার তাঁহাকে যদি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়" বলিয়া ভাবিতে হয় ও এই সকল কথার যদি

কোন অর্থ থাকে, এবং সেই অর্থ যদি আমাকে চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সেই ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা একাগ্রতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তদ্দ্বারা উপাসনার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। তবে উপায় কি?

উপায় আছে। ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার কার্য্য, অনন্ত শক্তির কার্য্য, অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য, অনন্ত মঙ্গলের কার্য্য, অনন্ত প্রেমের কার্য্য চিন্তা করিতে চেষ্টা না করিয়া, সেই সকল কার্য্যের মধ্য হইতে, যেটী সহজে, বিনা আয়াসে, আমার মনে আসে, আমি যদি ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে অভ্যাস করি, তবে তদ্দ্বারা আমার সেই বিষয় অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থির হইতে পারে। * অবশ্য, তাঁহার অন্যান্য কার্য্য আমার দেখা একেবারে নিষেধ বলিতেছি না, তাঁহার মহিমা-সূচক অন্যান্য কার্য্যও দেখিব, কিন্তু তাহার মধ্যে একটী বিশেষ করিয়া সর্ব্বদা দেখিব। সেই কার্য্যটী, সেই ভাবটী, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমার মনে জাগরূক থাকা চাই। যেমন আমি আমার মাতাকে খুব ভালবাসি, পৃথিবীতে আর কাহাকেও আমি সেরূপ ভালবাসি না। আমার মার কথা সহজে, অনায়াসে, উদিত হয়, এমন কি সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। এই

---

* ভগবান পতঞ্জলি বলেন—

"তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য কোন একটী আপনার অভিমত তত্ত্ব অভ্যাস, অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটী মাত্র বিষয়ে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, একাগ্রতা জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয়"। "ভক্তিযোগ" (বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত)।

মাতৃত্বভাব সহজেই আমার মনে আসে বলিয়া, এই মাতৃত্ব অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতিও আমার মন অনায়াসে ধাবিত হইতে পারে; এবং এই মাতৃত্ব অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে আমার মন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্র হইতে পারে। এইরূপে নগেন্দ্র বাবু, "শিশুর সরলতা, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেম, ভক্ত জনের ভক্তি-রঞ্জিত মুখশ্রী, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অবলম্বনে যে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে যে কোন একটা ভাব অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থির করা যাইতে পারে।

এইরূপ কোন একটী ঐশ্বরিক ভাব চিত্তে পরিস্ফুটন করিতে হইলে, আমাকে তাহা কল্পনা দ্বারা করিতে হইবে। কিন্তু কল্পনা-শক্তি সকল লোকের সমান থাকে না। যদি সকলের সমান থাকিত, তবে সকল লোকই কবি, উপন্যাস-লেখক (novelist), চিত্রকর হইতে পারিত। যাহার নিজের কল্পনা-শক্তি নাই, সে অন্যের সাহায্যে অভীষ্টবিষয়ের কল্পনা করিতে পারে। যেমন, মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল কতদূর বিজ্ঞ, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (Mr. N. N. Ghose) তাঁহার যে উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি সে সকল কল্পনা করিতে ও অনুধ্যান করিতে পারি। তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ ছিল, আমি দেখি নাই; কিন্তু হ্যারিসন্ রোডে তাঁহার যে প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি তাঁহার আকার, অবয়ব প্রভৃতি কল্পনা করিতে পারি। আমি তাঁহার জীবনী পড়িয়াছি, ও তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতেছি। তাঁহার

মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমার মনে কি ভাবের উদয় হইবে? নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"সৃষ্টি দেখিলেই স্রষ্টাকে মনে হয়, প্রকৃতি দেখিলেই পুরুষকে মনে হয়, ইহা মানব মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তোমার কোন প্রিয়জনের হস্ত-রচিত একটী সামগ্রী দেখিলে যেমন সহজে স্বভাবতঃ তাঁহাকে স্মরণ হইবে, কুম্ভকার-নির্ম্মিত একটী মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিলে, সেইরূপ সহজে তাঁহাকে স্মরণ হইবার কি সম্ভাবনা আছে?"

অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবু প্রকারান্তরে বলিতেছেন, একটী মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিলে, তাহার কর্ত্তা যে কুম্ভকার, তাহাকেই স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে। শিল্পকার্য্য দেখিলে তাহার কর্ত্তাকেই যদি স্বভাবতঃ মনে পড়িত, তবে সুসভ্য ও গুণজ্ঞ পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণের নিকট রাফেল, রস্কিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর গণের চিত্র এতদূর আদৃত হইবে কেন? শুনিতে পাই, এই সকল চিত্রকরের এক একখানা ছবি দশ বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হয়। যাঁহারা এই সকল চিত্রের জন্য এরূপ অজস্র অর্থব্যয় করেন, তাঁহারা কি সেই সকল চিত্রকরের প্রতি মুগ্ধ হইয়া এত অর্থব্যয় করেন, না সেই সকল চিত্রদ্বারা যে সকল ভাব অভিব্যক্ত হয়, সেই সকল ভাবের অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হন? যদি চিত্রদ্বারা কেবল চিত্রকরের কথা মনে পড়িত, তবে তাঁহারা সে সকল চিত্রে এতদূর মুগ্ধ হইতেন না। সেই সকল চিত্রে কোন কোন বিশেষ চিত্তাকর্ষক ভাবের অভিব্যক্তি হেতু তাঁহারা তাহাদের এত আদর করেন। হ্যারিসন্ রোডে যে মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? কলিকাতাবাসী ব্যক্তিগণ কিজন্য এত অর্থব্যয় করিয়া সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সেখানে রাখিয়া-

ছেন? অবশ্য, সর্ব্বসাধারণকে তাহার নির্ম্মাতা শিল্পকরের শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইবার জন্য নহে; কিন্তু মাহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনী ও চরিত্র দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য; মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের বিজ্ঞতা, বাগ্মিতা, স্বদেশহিতৈষিতা, প্রত্যেকের হৃদয়ে উত্তেজিত করিবার জনা। আমি যখন সেই মূর্ত্তি দেখি, তখন আমার মনে এই সকল ভাবের পরিস্ফুরণ হয়। আমি যতক্ষণ সেই মূর্ত্তির নিকটে থাকি, ততক্ষণ আমার মন সেই সকল ভাবে তদ্গত হইয়া যায়। অবশ্য, একথা স্বীকার করি, যে ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালকে জানেন না, তাঁহার মনে সে সকল ভাব আসিতে পারে না; তিনি কেবল সেই মূর্ত্তির সহিত মনুষ্যাকৃতির প্রকৃত সাদৃশ্য দেখিয়া সেই শিল্পকরের কথাই ভাবিবেন। এইজন্য কথঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে, কিংবা ভাব গ্রহণের অধিকার না থাকিলে কেহ উপাসনায় অধিকারী হইতে পারে না।

নগেন্দ্র বাবু আবার বলেন,—

"কোন ব্যক্তির হস্তরচিত কোন সামগ্রী দেখিলে যেমন সেই ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, সেইরূপ তাঁহার একখানি ছবি দেখিলে কি তাঁহাকে স্মরণ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোন পরিচিত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্মরণ হয়। কিন্তু সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সেই ইন্দ্রিয়াতীত, অপার, অগম্য, চিন্ময় পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সে শিল্পী, সে চিত্রকর কোথায়? পুজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি উপনিষদে যাঁহার বিষয়ে বলিতেছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সে পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। * * তিনি

চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার কিছুই জানি না; এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, ইত্যাদি।"

তিনি আমদের বাক্যের অগোচর, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহার বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ক্ষান্ত হইয়া থাকি? তিনি আমাদের মনের অগোচর, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহাকে চিন্তা করি না? তাঁহার উপদেশ কি প্রকারে দিতে হয় আমরা জানি না, তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দেই না? অবশ্যই আমরা তাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহাকে মনে ভাবনা করি, তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ দেই। সে কি প্রকারে? না, উপনিষদগম্য নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের বাক্য, মন ও উপদেশের অগোচর হইলেও তাঁহার জগদাশ্রিত সগুণ অবস্থা আমাদের বাক্য, মন ও উপদেশের অগোচর নহে। সেইরূপ তাঁহার নির্গুণ অবস্থার কোন প্রতিমূর্ত্তিও নাই, তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারে, এমন শিল্পীও নাই। কিন্তু এই জগতে তাঁহার যে সকল জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল, দয়ার কার্য্য প্রকটিত হইয়াছে, ও নিরন্তর হইতেছে, আমরা সে সকল যেমন বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি, সেইরূপ চিত্রসাহায্যেও প্রকাশ করিতে পারি। বস্তুতঃ ভাষাবিদ্যা (সাহিত্য) ও চিত্র-বিদ্যার সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কিছু ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তাহাই আবার চিত্র দ্বারাও ব্যক্ত করা যায়। এই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেমন সাহিত্যের আদর করেন, সেইরূপ চিত্র-বিদ্যারও আদর করিয়া থাকেন। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের চিত্র হইতে পারে না বটে, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের চিত্র হইতে পারে।

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নাই, ইহা শ্রুতিই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। প্রথমতঃ আমরা এ কথা বলি না যে, নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন বাক্য মনের অগোচর, সেইরূপ তাঁহার চিত্রও হইতে পারে না। এস্থলে শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"তাঁহার প্রতিমা নাই।" দ্বিতীয় কথা এই, এস্থলে "প্রতিমা" অর্থে প্রতিমূর্ত্তি নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মূলের (context) সহিত মিল করিয়া অর্থ করিয়াছেন। নিম্নে শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করা হইল।* এই শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মের সদৃশ আর কেহ নাই, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি এক অদ্বিতীয় সত্তা।

উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা কি পাইলাম, একবার দেখা যাউক। আমরা দেখিলাম, (১) "অখিল ব্রহ্মাণ্ডে," "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থে" ও "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে, ভক্তজনের ভক্তি-রঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে", যে পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা দর্শন হয়, তাহা সাকার ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের দর্শন; আবার আমরা যখন ঈশ্বরকে "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়" বলিয়া ভাবি, তখন আমরা শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম, শান্তি, পবিত্রতা-প্রকাশক বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার সাকার চিত্র চিন্তা করি। (২) উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা সাধন; কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন

* "তস্য তস্যৈব ঈশ্বরস্য অখণ্ডসুখানুভবত্বাদেতাদৃশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা,—উপমা নাস্তি"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।১৯, শাঙ্করভাষ্য।

বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির চিত্র ক্রমাগত ভাবিতে গেলে, চিত্ত স্থির হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর চঞ্চল হয়। (৩) চিত্ত স্থির করিবার জন্য এই সকল অনন্ত ভাবরাশির মধ্য হইতে কোন একটী বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করা আবশ্যক। (৪) সেই ভাবপ্রকাশক কোন প্রতিমূর্ত্তি বা চিত্র আমাদের মনে সেই ভাব পরিস্ফুরণ করিতে অনেক সহায়তা করিতে পারে; এবং যাঁহাদের কল্পনাশক্তি ততদূর নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ মূর্ত্তি বা চিত্র নিতান্ত আবশ্যক। (৫) সেই মূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট থাকাতে, তদবলম্বনে তাঁহাকে পূজা করা যাইতে পারে। অতএব আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরকে প্রেমময়, মঙ্গলময়, দয়াময়, ভাবিয়া যদি প্রকৃতরূপে তাঁহার উপাসনা করা হয়, তবে সে উপাসনার ন্যায়সঙ্গত, অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাকার উপাসনা ও পৌত্তলিকতা।

নিরাকার উপাসনার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম পৌত্তলিকতা।

আর কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি "নিরুপম মাতৃস্নেহ" অবলম্বনে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে চাই। এই "নিরুপম মাতৃস্নেহ" বাক্যের অবশ্যই অর্থ আছে, ও ইহা চিন্তা করিলে সেই অর্থ বা বিষয় আমার মনে আসে; আমি একটী স্নেহময়ী জননীর চিত্র চিন্তা করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের কার্য্য ও অস্তিত্ব চিন্তা করি। কিন্তু এই চিত্রটী আমার মনে স্থিরভাবে থাকেনা, আমার মন স্বভাবতই চঞ্চল, হঠাৎ অন্যদিকে ধাবিত হয়; আমি

চাই, এই চিত্রটী সর্ব্বদা স্থিরভাবে মনে ধরিয়া রাখিতে। সেই জন্য আমি কোন সুনিপুণ শিল্পকর দ্বারা পটে, মৃত্তিকায়, কিংবা প্রস্তরে এইরূপ ভাব-প্রকাশক একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া লইলাম; আমি তাহা সর্ব্বদা দেখিয়া স্নেহময়ী মাতার অবলম্বনে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে পারি। স্নেহময়ী মাতার অবলম্বনে ঈশ্বরকে ধ্যান করার অর্থ কি? না, সেই মাতার স্নেহের সহিত ঈশ্বরের স্নেহ বা প্রেম অভেদভাবে চিন্তা করা, মাতার মূর্ত্তির সহিত ঈশ্বরকে মিলিতভাবে ভাবা,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গজাতীয় মাতার হৃদয়ে যে অনন্ত, অখণ্ড স্নেহ-স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, এই মাতার স্নেহ তাহার একটী কণিকা বিশেষ, আর এই মাতার মূর্ত্তি যাহার স্নেহকণা প্রকাশ করিতেছে, তাহা বিশ্বব্যাপী বিশ্বমূর্ত্তির অংশ বিশেষ। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আমি সেই মাতৃস্নেহ ও বিশ্ব-মাতার স্নেহ অভেদ দেখিলাম, সেই মাতৃমূর্ত্তিও বিশ্বমূর্ত্তিতে অভেদ দেখিতে পাইলাম। অভেদ দেখিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করি,——

"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যে দেবতা সর্ব্বভূতের মধ্যে মাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"বিশ্বের প্রাণরূপা বিশ্বব্যাপিনী এই মহাশক্তিকে যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ করিতে, ও তথা হইতে বিসর্জ্জন করিতে চায়, তাহার কি মহাভ্রম! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" প্রতিমার সম্মুখে, চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া পুরোহিত যখন এই মহা বাক্য আবৃত্তি করেন,

বুঝেনকা, তিনি কি বলিতেছেন? যেদিন হিন্দু সমাজ এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেদিন চিরদিনের জন্য হিন্দুহৃদয় হইতে পৌত্তলিকতা দূরে পলায়ন করিবে। অনন্তশক্তিকে যে পরিমিত স্থানে বদ্ধ করিতে চায়, সে অন্ধ।"(১)

অনন্ত শক্তিকে পরিমিত স্থানে যে বদ্ধ করিতে চায়, সে অন্ধ, স্বীকার করি। কিন্তু দাঁড়কাক যেমন কোন খাদ্য দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার সময় নিজে চক্ষু মুদিয়া জগৎকে অন্ধ মনে করে, সেইরূপ যিনি নিজে অন্ধ বলিয়া জগৎকে অন্ধ বলিতে চান, তাঁহার চেয়ে অধিক অন্ধ আর জগতে নাই। পুরোহিত ঠাকুর প্রতিমার সম্মুখে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" পড়েন বলিয়া যে তিনি সেই দেবীকে প্রতিমাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা কে বলিল? সেই শ্লোকের কি অর্থ এই যে, "মা তুমি প্রতিমাতে আবদ্ধ হইয়া থাক"? তবে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" এই শ্লোক প্রতিমার নিকট পড়া হয় বলিয়াই কি বুঝিতে হইবে যে, পুরোহিত ঠাকুর অনন্তশক্তিকে পরিমিত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষু আছে, ও যাঁহারা চক্ষুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, পুরোহিত কেবল প্রতিমার নিকট চণ্ডীপাঠ করেন না, কেবল দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারেই যে চণ্ডীপাঠ হয়, এরূপ নহে। অনেক বাড়ীতে দুর্গাপূজার একমাস পূর্ব্বে হইতে যখন প্রতিমার কোনই চিহ্ন থাকে না, তখন হইতেই চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, কোন কোন ধার্ম্মিক গৃহস্থ বৎসরের অন্য সময়েও চণ্ডীপাঠ করাইয়া থাকেন; কেহবা কোন ঘোর বিপদে পতিত

(১) ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় সংস্করণ, ৭৬ পৃষ্ঠা।

হইয়া কাতর প্রাণে জগন্মাতার শরণাপন্ন হইয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন; কাহারও আবার চণ্ডীপাঠ সন্ধ্যা আহ্নিকের ন্যায় নিত্যক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হইয়াছে; আবার কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে প্রতিমার নাম গন্ধও থাকে না, চণ্ডীপাঠের কোন স্থানভেদ থাকে না, কোন কালভেদও থাকে না। যে পুরোহিত ঠাকুর দুর্গোৎসবাদি পূজায় প্রতিমার সম্মুখে চণ্ডীপাঠ করেন, তিনিই এই সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনাতে বা নিত্যক্রিয়াতে চণ্ডীপাঠ করেন। অতএব দেখা গেল, প্রতিমার সহিত ও পুরোহিত ঠাকুরের চণ্ডী পাঠের সহিত কোন অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিত্য সম্বন্ধ নাই। যেমন প্রতিমার নিকটে চণ্ডীপাঠ হয়, সেরূপ আরও সহস্র সময়ে সহস্র স্থানে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। সুতরাং পুরোহিত ঠাকুর কোন দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে প্রতিমার নিকটে চণ্ডীপাঠাদি করেন বলিয়া তিনি অনন্ত শক্তিকে পরিমিত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। আর পুরোহিত ঠাকুর যদি অনন্তশক্তিকে প্রতিমাতে আবদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, তবে তিনি যখন ও যেখানে প্রতিমা থাকে না, তখনও সেখানে সর্ব্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা শক্তিকে পূজা করেন কিরূপে? চণ্ডীর এই কয়েকটী শ্লোকের অর্থ নিতান্ত সোজা, এমন কি যিনি সংস্কৃত জানেন না, তিনিও সহজে বুঝিতে পারেন। আজ কাল আমাদের পুরোহিতদিগের মধ্যে অনেক অজ্ঞ ও মূর্খ থাকিলেও, কোন পুরোহিত কি এতদূর বোকা হইতে পারেন যে, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" ইহার অর্থ বুঝি-

বেন যে, "যে দেবী কেবল প্রতিমাতে আবদ্ধ হইয়া আছেন" ? তাহাই যদি না হইল, তবে নগেন্দ্র বাবু "অনন্তশক্তি"কে "মৃত্তিকাতৃণ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ" করিয়া রাখিবার কথা কোথায় পাইলেন ? ইহা তাঁহার নিতান্ত গা'জুরি কথা। বস্তুতঃ অনন্তশক্তির বিশ্বজগতে যেরূপ প্রকাশ, জড়পদার্থে, মৃত্তিকাতৃণে, মৃত্তিকা-তৃণনির্ম্মিত প্রতিমাতেও সেইরূপ প্রকাশ। হিন্দুগণ জলে, স্থলে, ফুলে, আকাশে, বায়ুতে, তৃণলতায়, তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, প্রতিমাতেও সেইরূপ তাঁহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে প্রভেদ এই, প্রতিমা সেই সর্ব্বব্যাপিনা অনন্তশক্তির কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাহা অন্য স্বাভাবিক জড়পদার্থে পারে না। সেই অনন্তশক্তির অনন্ত জগতে পরিব্যাপ্ত অনন্তভাব চিন্তা করিতে গেলে উপাসনার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না বলিয়া, তাঁহার কোন বিশেষ ভাবের প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বনে চিন্তা আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে সেই অনন্তশক্তিকে সেই প্রতিমারূপ কারাগারে বদ্ধ করা হয় না ; কারণ, যিনি প্রতিমা অবলম্বনে সেই বিশেষ ভাবের ধ্যান করেন, তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতিতেও সেই অনন্তশক্তির পূজা করিয়া থাকেন। যে পুরোহিত [illegible] প্রতিমা-অবলম্বনে সেই অনন্তশক্তির পূজা করেন, তিনিই আবার সর্ব্বাগ্রে নিজের হৃৎ-পদ্ম অবলম্বনে এবং কখনও জবাপুষ্প, কখনও পদ্মপুষ্প, কখনও অপরাজিতাপুষ্পে কখনও বিল্ববৃক্ষে, কখনও সূর্য্যে, অগ্নিতে, জলে অথবা জলপূর্ণ ঘটে, তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন, কিংবা দুর্গোৎসবাদি পূজার

প্রণালী অনুসন্ধানের চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে এরূপ জীব, এরূপ পদার্থ নাই, যাহা সেই অনন্তশক্তির অধিষ্ঠানরূপে দুর্গোৎসব পূজাতে পূজিত না হয়। অতএব প্রতিমাতে সেই অনন্ত শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

কেহ কেহ বলেন, জড় প্রতিমার চিন্তা করিতে করিতে চিত্তের জড়তা হয়। নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"সাকার নিরাকার পরস্পর বিপরীত। সুতরাং সাকার উপাসনা অভ্যাস করিলে, নিরাকার উপাসনায় সামর্থ্য জন্মে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, মানসিক নিয়ম বিরুদ্ধ। অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে কি আলোক দেখিবার শক্তি জন্মে? যত অধিক কাল অন্ধকারে বসিয়া থাকিবে, তোমার চক্ষু ততই আলোক দেখিবার অযোগ্য হইবে। যে সকল বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহার একটীর অভ্যাস দ্বারা অপরটীর অভ্যাস করিবার শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশই হ্রাস হইয়া যায়। সাকার ও নিরাকার পরস্পর বিপরীত। একের অভ্যাসে অন্য বিষয়ের সাধনশক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।" *

নিরাকার শব্দ সাকার শব্দের বিপরীত স্বীকার করি; কিন্তু নিরাকার চিন্তা বা নিরাকার উপাসনা সাকার চিন্তা বা সাকার উপাসনার বিপরীত তাহা বলিতে পারি না। নিরাকার বস্তুকে আমরা চিন্তা করিতে পারি না, নিরাকার চিন্তা করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সাকার চিন্তা করিতে হয়, ইহা ইতিপূর্ব্বে 'দয়াময়', 'জ্ঞানময়' প্রভৃতি চিন্তার উদাহরণ দিয়া বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছি। নাগেন্দ্র বাবু নিজেই এ কথা অন্যস্থানে স্বীকার করিয়াছেন,—

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

"কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাকারের জ্ঞান নাই। এ কি কথা! নিরাকারের জ্ঞান, অভাবাত্মক জ্ঞান, (negative idea) নিশ্চয়ই আছে। সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারের অভাবাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে। নিরাকার কি? না, যাহা সাকার নহে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে আমরা নিরাকার ভাবি, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। নিরাকার আবার ভাবিব কি? আকার নাই, আকার নাই এই কি একটা ভাবিবার বিষয়?" *

নগেন্দ্র বাবু একস্থানে বলিলেন, সাকার চিন্তা করিতে করিতে নিরাকার চিন্তা করিবার সামর্থ্য জন্মে, ইহা মানসিক নিয়মবিরুদ্ধ, কারণ সাকার ও নিরাকার আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার এখনি বলিতেছেন, "যাঁহারা মনে করেন যে আমরা নিরাকার ভাবি, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। নিরাকার আবার ভাবিব কি?" অর্থাৎ নিরাকার ভাবিবার বিষয় নহে। ভাবিতে গেলে সাকারই ভাবিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, নিরাকার ও সাকার চিন্তায় যদি আলোক ও আঁধার সম্বন্ধ হয়, তবে নিরাকারবাদী কি প্রকারে সাকার ভাবিতে ভাবিতে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন? নিরাকারবাদীও মানুষ, সাকারবাদীও মানুষ; নিরাকারবাদীর মন যেরূপ, সাকারবাদীর মনও সেই একরূপ। সাকারবাদীর পক্ষে যাহা মানসিক-নিয়মবিরুদ্ধ হইল, নিরাকারবাদীর পক্ষে তাহা মানসিক-নিয়মবিরুদ্ধ হইবে না কেন? আর অভাবাত্মক জ্ঞান কাহাকে বলি? আমাদের যখন অভাবাত্মক জ্ঞান হয়, তখন যে জিনিসের অভাব আছে বলিয়া আমরা জানি, তখন সে জিনিসটা অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। "আকাশে মেঘ

* "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৫০ পৃষ্ঠা।

নাই" এই একটী অভাবাত্মক জ্ঞান। এস্থলে আকাশ ও মেঘ উভয়ই আমরা চিন্তা না করিয়া, কখনও এ জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সেইরূপ "ব্রহ্মের আকার নাই", "ব্রহ্ম নিরাকার" আমরা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদিগকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা কিছু চিন্তা করিতে হয় (অবশ্য আমাদের যতটুকু জানা আছে); আবার গোল, কি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ আমাদের চিন্তা করিতে হয়। কারণ, ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি চিন্তা মাত্রেই জড়বস্তুর চিন্তা। সুতরাং ব্রহ্মের চিন্তাও কোন জড়বস্তুর চিন্তা হইবে। এ সকল অবশ্যই সাকার পদার্থের চিন্তা। অতএব নিরাকার চিন্তা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সাকারও চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং নগেন্দ্র বাবু নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাসনাকে যে আলোক ও আঁধারের ন্যায় বিপরীত বলেন, সে কেবল কথার মা'র পেঁচ। সে কথার কোন অর্থ নাই।

যাহা হউক জড় প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিলে, মন জড় হইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। যখন আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে চক্ষু মেলিলেই চারিদিকে জড়বস্তু দেখিতেছি, আবার চক্ষু মুদিলে ও জড় বস্তুর ভাবনা ভাবিতেছি; আমরা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল জড়বস্তুরই চিন্তা করিয়া থাকি, অথচ কিন্তু আমাদের মন জড় হইয়া যায়না; তখন কেবল ঈশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিলেই মন জড় হইয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। জড়-চিন্তা ভিন্ন উপাসনা হইতে পারেনা, ইহা "দয়াময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানময়" প্রভৃতি উদাহরণ দিয়া বুঝান হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিলাম, "নিরুপম মাতৃস্নেহে" ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইলে একটী মাতার মূর্ত্তি, তাঁহার স্নেহপূর্ণ মুখশ্রী কল্পনা

করিতে হয় ; বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি সেইরূপ কল্পনা করিতে আমাদিগকে সাহায্য করে। এইরূপে ঈশ্বরকে "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পবিত্রতাময়" প্রভৃতি ভাবে চিন্তা করিতে হইলেও আমাদিগকে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম, পবিত্রতা প্রকাশক কোন ব্যক্তি, বস্তু, বা ঘটনার সাকার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পবিত্রতাময়" বলিয়া ভাবিতে গেলে, ক্রমাগতঃ এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আমাদের মন ঘুরিয়া বেড়ায়, জগতে তাঁহার এই সকল গুণপ্রকাশক কার্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহাতে চঞ্চল মন আরও অধিকতর চঞ্চল হয় ; সুতরাং সে উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়না। আবার একথাও ঠিক, যে ইহার মধ্যে কোন একটী মাত্র ভাব গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে ঈশ্বরকে ধ্যান করিলে আমি তাঁহাকে অন্যান্যভাবে দেখিতে পাইনা। "স্নেহময়ী জননী" তে তাঁহার প্রেম ভাবিতে গেলে, তাঁহাকে "জ্ঞানময়" বলিয়া ভাবিতে পারিনা ; আবার "জ্ঞানময়" বলিয়া ভাবিতে গেলে, "প্রেমময়" কিংবা "শক্তিময়" বলিয়া ভাবিতে পারিনা। কারণ ঈশ্বরের এই সকল ভাব চিন্তা করিতে হইলে আমাদিগকে কেবল স্বভাবের উপর, প্রাকৃতিক জগতের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঈশ্বরের এই সাকারভাবপ্রকাশক প্রাকৃতিক ঘটনাবলী আমাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাতে হয় কেবল প্রেম-প্রকাশক একটী ঘটনা, নতুবা কেবল জ্ঞান-প্রকাশক একটী চিত্র, নতুবা কেবল মঙ্গল-প্রকাশক একটী দৃশ্য, আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু একাধারে তাঁহাকে "প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়,

শক্তিময়, পবিত্রতাময়" রূপে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনায় সচরাচর দেখিতে পারিনা। তবে অবশ্য আমাদের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি হয়, ততই যেখানে জ্ঞান, সেখানেই প্রেম, যেখানে শক্তি সেখানেই মঙ্গলের কার্য্য দেখিতে পারা যায়। কিন্তু সে অতি উচ্চ অবস্থার কথা। এই সকল ভাব আমি সচরাচর জগতে একাধারে দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু আমার সাধনের জন্য সেই সকলকে একাধারে দেখাই আমার আবশ্যক। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ব্যক্তি বা ঘটনায় এ সকল দেখিতে গেলে আমার চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়না। আর কেবল একটামাত্র গুণ বা ভাব কোন আধারে ধ্যান করিতে গেলে অন্যভাব চিন্তা করিবার আনন্দ পাইনা, বরং বারংবার একটা ভাব ভাবিতে ভাবিতে—কেবল এক স্নেহময়ী জননীর মুখশ্রী চিন্তা করিতে করিতে অনবরত এক বিষয় চিন্তা হেতু বিরক্তি (monotony) বোধ হয়। এই জন্য আমাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবলম্বন ছাড়িয়া শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বাহ্য জগতের প্রতিরূপ কল্পনা (Reproductive imagination) ছাড়িয়া, আবিষ্কারক (constructive imagination) এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে এইরূপ একটী চিত্র অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে মাতার স্নেহ আছে, জ্ঞানীর জ্ঞান আছে, ভক্তের প্রেম আছে, শিশুর সরলতা আছে, সাধুর পবিত্রতা আছে, অনন্ত-জগৎ-পরিচালক শক্তি আছে, জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নিরূপে অথবা বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যতের সাক্ষীরূপে তিনটী চক্ষু আছে, যাহাতে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিবার জন্য, দশদিগ্‌বিলম্বী বিবিধ

প্রহরণ-শোভিত দশটী হস্ত আছে, যাহাতে পাপাসুরকে বিনাশ করিবার জন্ত দুর্দ্দমনীয়, অজেয় সিংহবিক্রম আছে, আবার যাহাতে ঘোর পাপ-সাগরে নিমগ্ন পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্ত বরাভয়যুক্ত দুইখানি কর আছে, আমি এইরূপ একটী চিত্র চাই, যাহাতে আমি একাধারে সেই "নিখিলভুবনব্যাপিনী, অসীম অনন্তরূপিনী, রূপবিবর্জ্জিতা, সর্ব্বরূপ প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা, দশভুজা, অসুরনাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মহাদেবীকে" * দর্শন করিয়া তাঁহাকে অনবরত ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি। এই রূপ সর্ব্বভাবপ্রকাশক, সর্ব্বশক্তির আধার, সর্ব্বগুণের আশ্রয় একটী চিত্র আমি সৃষ্টির মধ্যে, ত্রিভুবনে, প্রাকৃতিক জগতে কোথায় খুঁজিয়া পাইনা। তাই "অপরিসীম সুক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী, প্রকৃতিদর্শী" † ঋষি কল্পনা দ্বারা একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন "হে সাধক! এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তোমাকে এখন আর "শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময়,পবিত্রতাময়" কে ধ্যান করিতে সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবেনা। এই দেখ একাধারে তুমি যাহা কিছু চাও, যতগুলি ভাব তোমার হৃদয়ে ধারণা করিতে পার, তাহাই পাইবে"। (১) ধন্ত ঋষি! ধন্ত তোমার তত্ত্বজ্ঞান!! ধন্ত তোমার জীব-দয়া!!!

প্রাকৃতিক জগতের অনেকগুলি চিত্র বা দৃশ্যের সমবায়ে এই

---

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড—৭৫ পৃষ্ঠা। † ভূদেব বাবু কৃত "পুষ্পাঞ্জলি"।

(১) চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥' কুলার্ণব।

অদ্ভুত অনুপম চিত্র উদ্ভাবন করিয়া, জগতের তিল তিল সৌন্দর্য্য একাধারে সংগ্রহ পূর্ব্বক এই তিলোত্তমা মূর্ত্তি (২) নির্ম্মাণ করিয়া ঋষি দেখিলেন ইহা সহজে মনে ধারণা করা যায়না। আমরা জগতে যে সকল চিত্র দেখিতে সর্ব্বদা অভ্যস্ত, ইহা তাহা হইতে ভিন্ন ও জটিল রকমের বলিয়া ইহা সহজে কল্পনা করা যায়না। তবে বাহ্যিক কোন প্রতিরূপ দেখিলে, তাহার সাহায্যে ইহা মনে ধারণা করা যাইতে পারে, তাই প্রতিমার ব্যবস্থা করা হইল। ফটোগ্রাফ্ মানুষের প্রতিমূর্ত্তি ; কারণ, তোমার ফটো-গ্রাফ্ দেখিলে, তোমার সম্বন্ধে যতগুলি ভাব আমার জানা আছে তাহা আমার মনে উদিত হয় ; ফটোগ্রাফ্ সেই মানুষের সর্ব্ব-প্রকার ভাব প্রকাশ করে। সেইরূপ এই প্রতিমাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ; কারণ, ইহা দেখিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, মাতৃত্ব, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি মনে উদিত হয় ; এ সকল ভাব অবশ্য কোন

---

(২) অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখং।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
* * * * *
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাং।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥ চণ্ডী।

সৃষ্টপ্রাণী বা বস্তুর নহে, কেবল ঈশ্বরের। প্রতিমা ঈশ্বরের ভাব সকল প্রকাশ করে বলিয়া, তাহা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিমা সেই অনন্তশক্তির প্রতিমূর্ত্তি; আবার তোমার ফটোগ্রাফ্‌ও তোমার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই উভয় প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। তোমার ফটোগ্রাফ্‌ দেখিলে, সাদৃশ্য বশতঃ কেবল তোমাকে স্মরণ হয়; কিন্তু তুমি তোমার ফটোগ্রাফ্‌ হইতে পৃথক্‌ ভাবে আছ। প্রতিমা সেরূপ নহে। প্রতিমা দর্শনে সেই ঋষি-কল্পিত সর্ব্বভাব-শক্তি-গুণের আশ্রয় দেব-দেবীর মূর্ত্তি স্মরণ হয়, সেই প্রতিমার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে পতিত হইলে, হৃৎপদ্মে তাঁহাকে ধ্যান করা যায়, আবার বাহিরের প্রতিমাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার গুণ ও শক্তি লইয়া বিরাজমানা আছেন বলিয়া, সেই প্রতিমা অবলম্বনে তাঁহাকে পূজাও করা যায়।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরকে যদি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়" বলিয়া চিন্তা ও উপাসনা করা হয়; সে চিন্তা ও উপাসনা যদি কেবল মৌখিক ধন্যবাদ ও ফাঁকা বক্তৃতা না হইয়া আন্তরিক কোন ক্রিয়া হয়; আর তাহা যদি চিরন্তন মানসিক নিয়মের বশীভূত হইয়া করা হয়; তবে সে উপাসনা সাকার উপাসনা, তাহার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রতিমা পূজা বা "পৌত্তলিকতা"। নিরাকার উপাসনার যুক্তিসঙ্গত পরিণাম পৌত্তলিকতা।

"দেবগণের শরীর-সমুৎপন্ন, দিগন্তরব্যাপী, প্রভাবশালী, অপরিমেয় সেই তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া এক নারীরূপ অভ্যুদিত হইল। শম্ভুর তেজ

ঈশ্বরের রূপদর্শন।

ঈশ্বরের রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না, ইহার উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন, ঈশ্বরের রূপ কি কেহ কখনও দেখিতে পারে? এই যে সাকারবাদিগণ প্রতিমা পূজা করেন, তাঁহারা কি কখনও ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পারেন? ঈশ্বর প্রতিমাতে আগে অধিষ্ঠিত থাকেন না; প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে আসেন, আবার বিসর্জ্জন করিলে চলিয়া যান। কেহ কি কখনও তাঁহাকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন? উপাসকগণ প্রথমে সেই জড়প্রতিমাই দেখেন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরেও সেই জড়-প্রতিমা দেখেন, আবার বিসর্জ্জনের পরেও সেই জড়প্রতিমাই দেখেন। অতএব ঈশ্বরকে কেহই দেখিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব বিশ্বাস করেন এই মাত্র; সেরূপ বিশ্বাস নিরাকারবাদীরও আছে। তবে তোমার রূপদর্শন কথার কোন অর্থ নাই। পাছে তাঁহার যুক্তির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, এই জন্য নগেন্দ্র বাবুর নিজের কথা তোলা যাইতেছে,—

"তুমি কুম্ভকার নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখ,—প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার

দ্বারা তাঁহার মুখ, যমের তেজ দ্বারা তাঁহার কেশ, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু সকল হইল। চন্দ্রতেজে তাঁহার স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে কটিদেশ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথ্বীতেজে তাঁহার নিতম্ব সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মতেজে পাদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি সকল, বসুদিগের তেজে নাসিকা হইল। * * * * * অনন্তর দেবগণের তেজোরাশি-সমুদ্ভবা সেই দেবীকে দেখিয়া মহিষাসুর-পীড়িত দেবগণ হর্ষযুক্ত হইলেন।" -

পরে, বিসর্জ্জনের পরে, কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তিই দেখ। তাহাতে যে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহা দেখিতে পাও না; আবির্ভাব, তিরোভাব কিছুই দেখিতে পাওনা। তবে কেন বল রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না? তুমি আপনিই বলিতেছ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় ঐ মূর্ত্তি তোমার পূজার বিষয় নহে। উহাতে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাই তোমার পূজার বিষয়। কিন্তু যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা কি তোমার প্রত্যক্ষের বিষয়? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে, জড়নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রয়োজন থাকিত না। তবে কেন বল যে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না? তোমার চক্ষু যাহা দেখিতেছে, তাহার পূজা করিতেছনা; কখন যাহা দেখিতে পাওনা তাহারই পূজা কর, তবে কেন বল যে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না?" *

তৎপরে নগেন্দ্র বাবু বলেন, 'দেখা' অর্থে চর্ম্মচক্ষে দেখা, আর জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করা। চর্ম্ম-চক্ষুদ্বারা দেখিতে গেলে আমরা ঈশ্বর কেন, কোন মনুষ্যকেও দেখিতে পাই না। আমরা চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা কেবল মনুষ্যের স্থূল জড়দেহ মাত্র দেখি; অসার মনুষ্যের সার যে জীবাত্মা, তাহাকে আমরা দেখিতে পারি না। পারি কেবল জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা।

"তোমার পূজনীয়া জননীর কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া বিদেশ হইতে গৃহে আসিলে। আসিয়া দেখিলে, তোমার জননীর মৃতদেহ গৃহপ্রাঙ্গনে শয়ান। তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে, বলিলে, "হায়! মা'র সঙ্গে দেখা হইল না!" এস্থলে জিজ্ঞাসা করি কাহার সঙ্গে দেখা হইল না? কি দেখা হইল না? কেন, তুমি পূর্ব্বেও যাহা দেখিতে, এখনও তাহাই দেখিতেছ? পূর্ব্বে যে হস্ত, পদ, নাসিকাদি অঙ্গনিচয় দেখিতে, যে জড়দেহ দেখিতে, এখনও ত তাহাই দেখিতেছ? পূর্ব্বে এমন কি দেখিতে পাইতে যাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না? * * * জড়দেহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। পূর্ব্বে

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" ৯—১০ পৃষ্ঠা।

তুমি তাহা দেখিতে পাইতে, এখনও তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু পূর্ব্বে সেই দেহে যে চৈতন্ত পদার্থের আবির্ভাব ছিল, সেই জীবাত্মা এখন আর নাই। সেই জন্যই তুমি বলিতেছ "হায় দেখা হইল না!" * * * যখন তুমি বলিলে, "হায়! দেখা হইল না!" তখন দেখা শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছ? চর্ম্মচক্ষে দেখা অর্থে নিশ্চয়ই না। কেন না চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেও যেমন দেখিতে, এখনও সেইরূপ দেখিতেছ। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম যদি দেখা হয়, বিশ্বাসনয়নে চৈতন্য পদার্থকে গ্রহণ করার নাম যদি দেখা হয়, তাহা হইলে, তুমি পূর্ব্বে সে মৃত-দেহে যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে, তাহাই এখন দেখিতে পাইতেছ না।" *

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চৈতন্ত পদার্থকে সাক্ষাৎ অনুভব করা বড়ই উচ্চ অধিকারের কথা। শ্রুতি বলেন,—

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি।"

ধীর ব্যক্তি শরীরমধ্যস্থ সেই অশরীরী, অনিত্য পদার্থে অবস্থিত সেই নিত্যবস্তু, মহান্, বিভু, আত্মাকে জানিয়া কখনও শোক করেন না। চৈতন্ত পদার্থকে যখন জানিতে পারা যায়, তখন কোন শোক তাপ থাকে না, কারণ কোন বস্তুর অভাব বোধ থাকে না। উক্ত বিদেশাগত ব্যক্তি যদি সেই অধিকারের লোক হইতেন, তবে তিনি মায়ের পীড়ার কথা শুনিয়া গৃহে আসিবেন কেন? বিদেশে থাকিয়াই ত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা মাতাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন ও তাঁহার দেহত্যাগের কথা জানিতে পারিতেন। লৌকিক আচারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি বা গৃহে

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা।

আসিলেন, কিন্তু "হায় মায়ের সঙ্গে দেখা হইল না!" বলিয়া ক্রন্দন করিবেন কেন? তিনি ত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তখনও মাতাকে দেখিতেছেন। তিনি মাতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন, তখনও ত সেইরূপই করিতেছেন? কারণ তাঁহার মাতা যদি কেবল চৈতন্য পদার্থ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস থাকিবে, তবে তাহার ত কোন জরা মরণ নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কোন কালেই অভাব নাই? সুতরাং বুঝিতে হইবে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চৈতন্য পদার্থের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে অবস্থার কথা, তিনি সে অবস্থা হইতে এখনও অনেক দূরে আছেন, তিনি জ্ঞানচক্ষে মাতার চৈতন্যাংশ দেখিতে পান না। তিনি কেবল জড় শরীরও দেখিতে চাননা, আবার কেবল চৈতন্যও দেখিতে পান না; তিনি চান সেই জড়শরীরের মধ্যস্থিত চৈতন্য পদার্থকে দেখিতে। সেই জড়শরীরাশ্রিত চৈতন্য পদার্থই তাঁহার মাতা। সেই জড়শরীর হইতে পৃথক ভাবে তাঁহার মাতার অস্তিত্ব নাই, * আবার সেই চৈতন্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত জড় শরীর ও তাঁহার মাতা নহে। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সকলেরই এই দশা। আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধব সকলেই এই জড়শরীরাশ্রিত চৈতন্য পদার্থ। তাঁহাদিগের জড়শরীর যেমন আমরা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, সেইরূপ তাঁহাদের চৈতন্যাংশও আমরা জড় শরীরের সহিত মাখামাখিভাবে দেখিতে পারি, মাতা যেমন পুত্রের বিষয় ভাবিতে, তাহার কথা শুনিতে যেমন

* স্থুল জড়শরীর হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রেতযোনি বলে।

উৎসুকা, সেইরূপ তাহার মুখখানি দেখিবার জন্য ও লালায়িতা। পিতা বিদেশস্থ পুত্রের নিকট সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়া থাকেন, ও তাহার সংবাদও সর্ব্বদা পাইয়া থাকেন; তাহাতে পুত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য এতদূর উৎসুক হন কেন? না, সচরাচর আমাদের জ্ঞানচক্ষু অপেক্ষা চর্ম্মচক্ষু অধিকতর বিকশিত। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের চর্ম্মচক্ষু উন্মীলিত হয়, চর্ম্মচক্ষুর ব্যবহারে অনেক দিন অভ্যস্ত হইলে, তবে জ্ঞানচক্ষুর কার্য্য আরম্ভ হয়। সেইজন্য জ্ঞানচক্ষুর দর্শন অপেক্ষা চর্ম্মচক্ষুর দর্শন আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। আর অন্য বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহার যতটুকু বাহ্যিক, যতটুকু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাই আমরা আগে দেখিতে পাই। সেই চক্ষুদ্বারা যাহা দেখা যায়, জ্ঞান তাহা লইয়াই বিচার করে। চক্ষু জ্ঞানের উপযোগী বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিলে তবে জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসার পূর্ব্বে আমরা চক্ষুদ্বারা তাহার রূপ গুণ প্রত্যক্ষ করি, তৎপরে তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মে। একজন সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে, যতদূর ভালবাসা জন্মে, দূর হইতে তাহা জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বে যাহার সহিত কখন পরিচয় ছিল না, এরূপ ব্যক্তিকে ভালবাসিতে হইলে, চাক্ষুষ দর্শন বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, হঠাৎ চারি চোখে মিলন হইল, অমনি ভালবাসা জন্মিল—এরূপ ঘটনা সচরাচর অনেক ঘটিয়া থাকে। জগতের কবিগণ এইরূপ ভালবাসার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

ইংরেজীতে ইহাকে love at first sight বলে। যাঁহারা জন্মান্ধ তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও ভালবাসা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে তাঁহারা এই একটা প্রধান ইন্দ্রিয়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত। আর যাঁহারা এই ইন্দ্রিয় থাকিতে, ভ্রান্তি বা কুসংস্কার বশে ইহার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সেই জন্মান্ধ হইতে আরও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

আমরা দেখিলাম, কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা চৈতন্য পদার্থের প্রত্যক্ষ দর্শন অতি উচ্চ অবস্থার কথা। আমরা সচরাচর জড়-দেহে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কাজ হইয়া থাকে। একথা নগেন্দ্র বাবু নিজেও কতকটা স্বীকার করিয়াছেন, "আমরা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা কেবল জড়দেহ দেখি। আর আত্মা বা মন দ্বারা সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মা ও মনকে দেখি। সেই জন্যই মৃত আত্মীয়ের দেহ দেখিয়া লোকে বলে "দেখা হইল না।" কি দেখা হইল না? চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায় না, সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখা হইল না।"

তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিলেন, আমরা "দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে"ই দেখিতে যাই, কেবল আত্মাকেও দেখিতে যাইনা; আবার কেবল দেহকেও দেখিতে যাইনা— সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখিতে না পারিলেই লোকে বলে "দেখা হইল না"। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখা যায় না একি কথা? যদি চর্ম্মচক্ষে দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখা না যাইবে, তবে তাহা না দেখিতে পারিলে লোক

করা হয় কেন? চর্ম্মচক্ষু দ্বারা একটা সজীব জীবন্ত মানুষ (আত্মা ও জড়ের সমষ্টি) কে অবশ্যই দেখা যায়। জীবন্ত মানুষ হাসে, কাঁদে, কথা বলে, চলিয়া বেড়ায় এ সকল কি চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না? চর্ম্মচক্ষে সেই দেহছাড়া আত্মাকে দেখিতে পারে না স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখিতে পারে না ইহা মানিতে পারি না। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, সকলেই দেখিতেছে, তাহা স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নগেন্দ্র বাবু নিজেও তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিতেছেন; তাই বলেন—

"এখন সেই পূর্ব্বপ্রশ্ন আবার আসিতেছে,—পরমেশ্বরকে কি দেখা যায়? যেমন, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজনকে দেখা যায়, পরমেশ্বরকে কি সেইরূপ দেখা যায়? মাতা,পিতা প্রভৃতি সকলকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না; পরম মাতা, পরম পিতাকেও চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, মাতা, পিতা, প্রভৃতিকে তাঁহাদের স্থূল দেহের সাহায্যে, তাঁহাদের স্থূলদেহ অবলম্বনে দেখিতে পাই। পরমেশ্বরকে কি অবলম্বনে দেখিব?"

এতদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া নগেন্দ্র বাবু এখন 'পথে' আসিলেন। প্রথমতঃ তিনি রূপদর্শন ভিন্ন ঈশ্বরের পূজা হয় না, এই মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার যুক্তি এই—

যাঁহারা রূপদর্শনের কথা বলেন, তাঁহারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও পরে কেবল জড় প্রতিমার রূপই দেখেন, ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পারেন না। তৎপরে আর একপদ অগ্রসর হইয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন, ঈশ্বরের রূপ কেন, কেহ কোন মানুষের রূপও দেখিতে পারে না। কারণ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা, মানুষের জড়-

দেহ দেখা যায়; আর জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা, সেই মানুষকে অর্থাৎ তাহার চৈতন্যাংশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এখন এ যুক্তির এক দোষ ঘটিল। যদি জ্ঞান-চক্ষু দ্বারাই মানুষকে দেখা যায়, তবে মানুষ মরিয়া গেলে, অর্থাৎ জড় দেহ হইতে চৈতন্য পৃথক্ হইলে, তাহাকে দেখা যায় না কেন? আর মৃত :ব্যক্তির জন্য শোকই বা করা হয় কেন? মাতা যখন পুত্রের মুখ দেখিবার জন্য লালায়িত হন, তখন তিনি কি পুত্রের মধ্যস্থ কেবল চৈতন্যাংশ দেখিতে চান? তিনি ত দূর হইতেই জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা তাহা দেখিতেছেন। তাহা হইলে দেখা গেল, মানুষ অর্থে কেবল মানুষের চৈতনাংশ নহে; মানুষ জড়দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্য পদার্থ, মানুষ দেহধারী আত্মা। সুতরাং মানুষকে দেখার অর্থ, কেবল চৈতন্যাংশকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখা নহে; দেহাশ্রিত আত্মাকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখা। যেমন মানুষকে আমরা জড়-দেহের অবলম্বন ভিন্ন দেখিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ও জড় অবলম্বন ভিন্ন দেখা যায় না। মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যেমন পূর্ব্বে তাহার রূপ দর্শন করা আবশ্যক, ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেও তাঁহার রূপদর্শন করা আবশ্যক। অন্ধব্যক্তি যেমন জ্ঞানলাভের এই সহজ ও প্রধান উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজকে হতভাগ্য মনে করে, সেই রকম যাঁহারা চক্ষু থাকিতে ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিতে ভ্রান্তিবশে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকেও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। নগেন্দ্র বাবুও বলিতেছেন,—

"কিন্তু এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, মাতা, পিতা, প্রভৃতিকে তাঁহাদের স্থূল দেহের সাহায্যে, তাঁহাদের স্থূলদেহ অবলম্বনে দেখিতে পাই। পরমে-

শ্বরকে কি অবলম্বনে দেখিব? এই অত্যদ্ভুত, সুকৌশলময়, পরম সুন্দর বিশ্বও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরমদেবতাকে দর্শন করিবে।

"পিতৃ মাতৃদেহে যেমন জীবাত্মা অবস্থিত, সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরম পিতা, পরম মাতা অবস্থিত। জীবাত্মা যেমন দেহে অবস্থিত, পরমাত্মা সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে বাহিরে স্থিতি করেন। জীবাত্মা যেমন দেহকে পরিচালিত করিতেছেন, পরমাত্মা সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতি নিবন্ধন যেরূপ জীবদেহের জীবন, সেইরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবন। * * * * জীবিত মনুষ্যের দেহ দেখিলে যেমন একভাবে তাহার আত্মাকে দেখা হয়, প্রকৃতরূপে দেখিতে জানিলে এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও এক ভাবে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখা হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়"। (১)

নগেন্দ্র বাবু এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডকে মনুষ্য শরীরের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইলেন যে, মানুষের শরীর দ্বারা যেরূপ তাঁহাকে দেখা যায়, ঈশ্বরের এই ব্রহ্মাণ্ড-শরীর দ্বারাও তাঁহাকে সেইরূপ দেখা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড-দেহ অবলম্বনে ঈশ্বরকে পূজা করিতে তিনি উপদেশ দিতেছেন। এমন কি অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, সাধনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ অবলম্বনের নিতান্ত প্রয়োজন। (২) তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবু এখানে নিজেই স্বীকার করিতেছেন "ঈশ্বরোপাসনায় রূপদর্শনের নিতান্ত আবশ্যক"। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়া-

(১) সাকার ও নিরাকার উপাসনা।" ১৩ পৃষ্ঠা।

(২) "সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বনের প্রয়োজন"। "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" ২৫ পৃষ্ঠা।

ছেন, এখন তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, সাকারবাদিগণ প্রতিমাতে ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করেন। (১) নগেন্দ্র বাবু বলেন—

"এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থে তাঁহার রূপদর্শন করিয়া পূজা কর।" এখন কথা হইতেছে "প্রতিমা" কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া কোন বস্তু? ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন পদার্থ যদি ব্রহ্মপূজার অবলম্বন হইতে পারে, তবে প্রতিমার কি অপরাধ? ইহার উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন, (প্রতিমা অবলম্বনে)

"আপত্তি এই জন্য যে, প্রতিমা মিথ্যা, কল্পিত, আমি সত্য চাই। সত্যই গম্যস্থান, সত্যই পথ। তবে মিথ্যা কল্পনা অবলম্বন করিব কেন?"

দ্বিতীয় আপত্তি—"পরমেশ্বরের কি প্রতিমা আছে? তাঁহার কি প্রতিরূপ সম্ভব? যাহার রূপ আছে, তাহার প্রতিরূপ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যিনি অরূপ, চিন্ময়, তাঁহার প্রতিরূপ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আর যখন তাঁহার মূর্ত্তি নাই, তখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিবে?"

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি আছে। যেখানে গুণ আছে সেখানেই রূপ আছে। রূপ ও আকারবিহীন গুণবাচক পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের অগোচর, চিন্তার অতীত। (২৬পৃষ্ঠা দেখ)। রূপ ও আকার ভিন্ন আমরা কোন গুণের চিন্তা করিতে পারি না; সে প্রকার চিন্তা মানসিক নিয়মের বিরুদ্ধ। ঈশ্বরচিন্তা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। সগুণ ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে হইলে, যে জগতে তাঁহার গুণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সাকার

(১) বাস্তবিক পক্ষে সাকারবাদিগণ প্রতিমা অবলম্বনেও যেরূপ ঈশ্বরের পূজা করেন, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য পদার্থ অবলম্বনেও সেইরূপ পূজা করেন।

সরূপ জগৎকেও চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। সেই প্রতিমূর্ত্তি এই "এই অত্যদ্ভুত, সুকৌশলময়, পরম সুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।"*

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে,—

"বিশ্বরূপাধ্যায় এব উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ॥
ঈশসূত্রবিরাট্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকা যক্ষরাক্ষসাঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালয়াদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥" চিত্রদীপ-২০৫-২০৮।

গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে ও ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে ঈশ্বরের এই বিরাট্‌মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত সেই বিরাট্‌মূর্ত্তির অবয়ব। ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বহ্নি, বিঘ্ন, ভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, চূত, যব, ব্রীহি, তৃণ, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, এই সকল স্বাভাবিক বস্তু, বাস্তু এবং কোদাল (অস্ত্রবিশেষ), এই সকল কৃত্রিম বস্তু, এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অথবা সেই বিরাট্ পুরুষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব। এই সকল মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি ফল প্রদান করেন।

অতএব জগতের প্রত্যেক বস্তু, জল, মৃত্তিকা, তৃণ, পাষাণ যদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি হইল, তবে সেই জল, মৃত্তিকা, তৃণ, পাষাণের

সমষ্টি যে জড় প্রতিমা, তাহাও তাঁহার মূর্ত্তি। সভ্যতার প্রথমাবস্থায় মানুষ জল, মৃত্তিকা, তৃণ, পাষাণ প্রভৃতি স্বাভাবিক বস্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের আকাঙ্ক্ষাও উচ্চে ধাবিত হয়, তাহাদের অভাব বৃদ্ধি হয়। তখন আর তাহারা সেই জল, মৃত্তিকা, তৃণ, পাষাণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তখন সেই জল-মৃত্তিকা-তৃণ-পাষাণের সমবায়ে সুদৃশ্য, অদ্ভুত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুখে বাস করিয়া থাকে। সেইরূপ জল, মৃত্তিকা, তৃণ, পাষাণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু উপাসকের হৃদয় যখন সে সকল ভাবে পরিতৃপ্ত হইতে চায় না, যখন তিনি একাধারে ঈশ্বরকে নানাভাবে দেখিতে বাসনা করেন, তখন তাঁহাকে সেই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে নানাভাব-প্রকাশক ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইতে হয়। যদি বল প্রতিমা কল্পিত, মিথ্যা; কিন্তু জগৎ কি সত্য? নগেন্দ্র বাবু নিজেই বলেন,—

"কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অসার, অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল; সকলই "ক্ষণ-বিধ্বংসী"। * অতএব প্রতিমা যেমন মিথ্যা, জগৎ ও সেইরূপ মিথ্যা। এই মিথ্যা জগতের অবলম্বনে ঈশ্বর পূজায় কোন দোষ না হইলে, প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বর পূজায় দোষ কি? যদি বল প্রতিমা মানুষের মনঃ-কল্পিত, জগৎ স্বাভাবিক।

"সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এবং প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কল্পনা ও সত্যে যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যে তত প্রভেদ"। (২১ পৃষ্ঠা)

---

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—১৯—২০ পৃষ্ঠা।

প্রাকৃত ও কল্পিত (invented) বস্তুর মধ্যে প্রভেদ আছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি যখন প্রাকৃত বস্তু চিন্তা করি, তখনও আমার মনে যেরূপ অবস্থা হয়, কল্পিত বস্তু চিন্তা করিলেও সেই একইরূপ অবস্থা হয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই উভয়রূপ চিন্তাই কল্পনা (imagination)। ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর উপরে বসিয়া আচার্য্য যখন "চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে" কিংবা "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে" ঈশ্বর চিন্তা করেন, তখন তিনি এ সকল কল্পনা করিয়া থাকেন; আবার প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া হিন্দু উপাসক যখন "ত্রিনেত্রা, দশভুজা, অসুরনাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রীর" ধ্যান করেন, তখনও তিনি কল্পনার সাহায্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। তবে প্রভেদ এই, প্রথমোক্ত কতকাংশ Reproductive imagination হইতে পারে, আর শেষোক্ত কল্পনা Constructive or inventive imagination। কিন্তু উভয় প্রকার কল্পনাতেই মন একইরূপে সাকার বস্তু চিন্তা করিয়া থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ঈশ্বরের যে সকল গুণ ও ভাব স্বাভাবিক বস্তুর সাহায্যে একস্থানে আমরা চিন্তা করিতে পারি না, তাহাই কল্পিত বস্তুর সাহায্যে আমরা চিন্তা করিয়া থাকি। স্বাভাবিক বস্তু যে সকল ভাব প্রদান করিতে অসমর্থ, কল্পিত বস্তু তাহাই প্রদান করিয়া থাকে। নিরকারবাদী কি কখনও এইরূপে কল্পিত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করেন না?

রূপের ন্যায় শব্দও ঈশ্বরপূজার সাহায্য করে। রূপ যেমন জড় পদার্থ, শব্দও সেইরূপ। রূপ যেমন কতকগুলি স্বাভাবিক,

কতকগুলি কৃত্রিম, শব্দও সেইরূপ কতকগুলি স্বাভাবিক, কতকগুলি কৃত্রিম। মানুষের কথা, পাখীর গান, বজ্রের নিনাদ, জলের কলকল ধ্বনি এ গুলি স্বাভাবিক শব্দ। আবার খোলের শব্দ, তানপুরার ঝঙ্কার, হারমোনিয়ামের স্বরলহরী এ সকল কল্পিত শব্দ। যেমন কল্পিত রূপ, স্বাভাবিক রূপের দ্বারা মনে যে সকল ভাবের পরিস্ফুরণ হয় না, তাহাই পরিস্ফুরণ করিয়া থাকে; সেইরূপ কল্পিত শব্দও, স্বাভাবিক শব্দ দ্বারা মনে যে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তাহাই উত্থাপিত করে। এখন জিজ্ঞাসা করি, নিরাকারবাদী কি কখনও শব্দকে কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন? তখন, কল্পিতরূপে অর্থাৎ প্রতিমায় অপরাধ কি? ইতিপূর্বে বিস্তারিতরূপে দেখাইয়াছি,* ঈশ্বরের অনেকগুলি ভাব একাধারে পরিস্ফুরণ করে বলিয়া প্রতিমার আবশ্যকতা। ইহা ছাড়া প্রতিমাতে অধিষ্ঠিতরূপে ঈশ্বরের পূজা করা যাইতে পারে, কিন্তু শব্দ দ্বারা আমরা সেরূপ কোন সাহায্য পাই না। ইহাই শব্দ হইতে রূপের বিশেষত্ব। বোধ হয় সকলেই জানেন, যেমন শব্দের সাহায্য (বাদ্য ও সঙ্গীত) না হইলেও নিরাকারবাদীর ঈশ্বরোপাসনা হইতে পারে, সেরূপ প্রতিমা না হইলেও হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনা হইতে পারে। প্রত্যহ সন্ধ্যা, আহ্নিক প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়াতে কেহ কখনও প্রতিমার সাহায্য গ্রহণ করেন না। তখন হৃৎ-পদ্মে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মানসপূজা করিতে হয় এবং কোন স্বাভাবিক পদার্থ (যেমন দূর্বা, জল, পুষ্প প্রভৃতি) অবলম্বনে বাহ্যপূজা করিতে হয়।

প্রতিমূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু আর একস্থানে বলিতেছেন —

"যাঁহারা বলেন দেবমূর্ত্তি ঈশ্বরের চিহ্ন বা প্রতিনিধিস্বরূপ (substitute) তাঁহাদের কথার উত্তরে সুকবি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা আরথারের (King Arthur) সহিত ভিন্ন দেশীয়া এক রাজকুমারীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। কন্যা দেখিবার জন্য রাজা না গিয়া তাঁহার একজন সভাসদ্‌কে প্রেরণ করিলেন। সভাসদ্ অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া বিবাহার্থিনী কন্যার ভ্রান্তি জন্মিল এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন, সুতরাং আরথারের সহিত তাঁহার বিবাহ দুর্ঘট হইল। পৌত্তলিকতা সেইরূপ। পুত্তলিকা যদি চিহ্ন বা প্রতিনিধি হয়, তবে উহা রাজা আরথারের প্রেরিত প্রতিনিধির ন্যায়। লোকে উহাকে প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেছে না, উহাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সকলই উহার চরণে সমর্পণ করিতেছে। ইহা নিশ্চয় যে, প্রতিমাকে লোকে বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের চিহ্ন স্বরূপ মনে করে না। তবে বলিতে পারেন যে, কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। যে দেবতার যেমন আকার, কাষ্ঠ মৃত্তিকাদিতে তাঁহার সেইরূপ মূর্ত্তি গঠিত হয়। দেবতা আসিয়া তাহাতে আবির্ভূত হন। এইরূপ বলিলে সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেকটা প্রকৃত কথা বলা হয়। তথাচ ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে অবোধ লোকে প্রতিমা ও প্রতিমাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে একীভূত করিয়া ফেলে। তাঁহাদের নিকট মূর্ত্তি ও দেবতা এক।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু একজন সুকবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে তাঁহার উপমায় দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ রাজা আরথারের সভাসদ্ যে অর্থে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন, প্রতিমা সে অর্থে ঈশ্বরের প্রতিনিধি নহে। রাজা আরথারের নিজের ছবি যে অর্থে তাঁহার প্রতিনিধি, প্রতিমাও সেই অর্থে দেবতার প্রতিনিধি। যেমন আরথারের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে কেবল তাঁহাকেই মনে পড়ে, শিব, বিষ্ণু,

দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে, পুরাণে বর্ণিত রূপ ও গুণাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সেই সেই দেবতা-কেই মনে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত রাজকুমারী ভ্রান্তিবশতঃ সেই সভাসদ্ ও রাজা আরথারকে এক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু উপাসক প্রতিমা ও দেবতাকে এক বলিয়া মনে করেন না। এ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু যাহা বলেন, তাহাই ঠিক্। "কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।'' প্রতিমাতে দেবতা আসিয়া আবির্ভূত হন। সুতরাং উপাসকগণ হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সকলই সেই প্রতিমার চরণে সমর্পণ না করিয়া, সেই দেবতার চরণে সমর্পণ করেন। তৃতীয় কথা, পাছে মূর্খ লোকে প্রতিমা ও দেবতাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে, এই আশঙ্কায় তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ "প্রাণপ্রতিষ্ঠা"র নিয়ম বিধান করিয়াছেন, ও উপাসনার মন্ত্র সকল স্থির ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে, জড় প্রতিমা পূজার বিষয় নহে, তাহার মধ্যে আবির্ভূত দেবতাই উপাস্য। পূজার মন্ত্র স্থির ও নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া, যে নিরেট মূর্খ তাহাকেও বাধ্য হইয়া, প্রতিমাকে পূজা না করিয়া তাহার মধ্যস্থ দেবতাকে পূজা করিতে হয়। সেরূপ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে হয়ত অজ্ঞলোকে "প্রতিমায়ৈ নমঃ," বলিয়া পূজা করিত; কিন্তু যে পূজার যে মন্ত্র তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে "কৃষ্ণায় নমঃ", কি "শিবায় নমঃ'', কি "দুর্গায়ৈ নমঃ", এইরূপে সেই প্রতিমা-অধিষ্ঠিত দেবতাকেই পূজা করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তি।

"অনন্তের মূর্ত্তি আছে কি না?" এই প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"পরমেশ্বর অনন্ত। মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি নাই। একথায় সাকারবাদী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝাইবে কেন? অসীম মূর্ত্তি কি অসম্ভব? যাঁহার সীমা নাই, তাঁহার মূর্ত্তিও কি অসীম হইতে পারে না? কখনই না। ত্রিকোণ বৃত্ত, কাঁটালের আম-সত্ব, সোণার পাথরবাটী ও অসীম মূর্ত্তি এ সকলই সমান সম্ভব। মূর্ত্তি থাকিলেই হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। একটী যেখানে শেষ হইয়াছে, আর একটা সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীর হইলেই, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবশ্য সীমা থাকিবে। সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্যই অসম্ভব কথা। অঙ্গ সকলের সীমা থাকিলেই হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গকে অবশ্য পরিমিত পদার্থ বলিতে হইবে। যাহার প্রত্যেক অংশ পরিমিত তাহার সমষ্টি অবশ্য পরিমিত; সুতরাং সমগ্র দেহ অবশ্য পরিমিত। যত কেন প্রকাণ্ড হউক না, দেহমাত্রেই অবশ্য পরিমিত। অসীম দেহ কখনও সম্ভব নহে। পরমেশ্বর অনন্ত; সুতরাং তিনি পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন না।"

"সাকার ও নিরাকার উপাসনা।" (১৬—১৭ পৃষ্ঠা)

"সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্য অসম্ভব কথা"। কেন? ইহা তোমার আমার বুদ্ধিতে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে তাহা অসম্ভব কেন? শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুনুন,—

অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তি।

"সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎসর্ব্বগতঃশিবঃ ॥" শ্বেতাশ্বতর।

সেই ভগবানের সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র গ্রীবা; তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অতএব তিনি সর্ব্বগত, মঙ্গলময়।

শ্রুতিকে অনুবাদ করিয়া গীতা বলিতেছেন,—

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" ১৩ অধ্যায়, ১৩।

ব্রহ্মের সর্ব্বত্র হস্ত, সর্ব্বত্র পদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র কর্ণ; এই ত্রিভুবনে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন।

অতএব "সকল অঙ্গ সকল স্থানে" ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর, কল্পনার অতীত বলিয়া, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া, আমরা কি বলিব, ইহা অসম্ভব?

আমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কাবস্থায় যাহা আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি, জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থায় তাহাই আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়। "অনন্তের মূর্ত্তি" আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে আসে না; কিন্তু একদিন অর্জ্জুন ভগবানের প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, স্তব করিয়াছিলেন,—

"অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥" গীতা ১১।১৬।

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, অনন্ত বাহু, উদর, বক্ত্র এবং নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি না।

এস্থলে একাধারে অনন্তরূপ ও বাহু উদরাদি অবয়ব অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা কি কবিত্ব? না, ইহা সত্য দার্শনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র বাবুর নিজের কথায় তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করা যাইতেছে।

তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম, অনন্ত ঈশ্বরের কোন আকার নাই। কিন্তু তুমি আমি কি সেই অনন্ত ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারি? আমাদের অনন্ত সম্বন্ধে আপেক্ষিক জ্ঞান হইতে পারে স্বীকার করি, যেমন যাহা পরিমিত নহে, তাহাই অনন্ত। এখানে আমরা পরিমিতকে প্রকৃতরূপে জানি, প্রকৃতরূপে চিন্তা করি; তাহার সঙ্গে অনুমান দ্বারা অনন্তের সম্বন্ধেও একটু আভাস পাইতে পারি। কিন্তু অনন্ত কি তাহা আমরা ধারণা বা ধ্যান করিতে পারি না। নগেন্দ্র বাবুও ঠিক্ এ কথা বলেন,—

"পরিমিত কাহাকে বলে, সকলেই বুঝে। কিন্তু অনন্ত কাহাকে বলে? অনন্তের লক্ষণ কি? যাহা পরিমিত অপেক্ষা বড় তাহাই অনন্ত। যখন পরিমিতকে জানি, তখন পরিমিত অপেক্ষা বড় এই বাক্যে কি ভাব, কি জ্ঞান প্রকাশ করে তাহা আমরা অবশ্যই বুঝি। পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। আপেক্ষিক জ্ঞান পরস্পরকে প্রকাশ করে। ভাল, মন্দ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, পিতা, মাতা, সন্তান, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি পরস্পর আপেক্ষিক। যে ভালকে জানে, সে মন্দকেও জানে; যে মন্দকে জানে, সে ভালকেও জানে। ......সেইরূপ পরিমিত বলিলেই অনন্ত বুঝায়।.........তবে অনন্তকে বুঝি না ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহার অর্থ এই যে, আমাদের পরিমিত

মনে উহার ধারণা হয় না। অনন্তকে অনন্ত বলিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারি না। উহা apprehend করিতে পারি, কিন্তু comprehend করিতে পারি না।......সেই অনন্ত পুরুষকে মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, অথচ সাধকও তাঁহাকে ধরিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করেন। একটী কলসে মহাসমুদ্র হইতে জল তুলিলাম। মহাসমুদ্র কলসের মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু কলসের যতটুকু আয়তন, সেই পরিমাণ সমুদ্রের জল উহাতে অবশ্যই ধরিবে। পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন তাহাতে কি? আমার হৃদয় যতটুকু, সেই পরিমাণে তাঁহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। আমার হৃদয় কলসের যেরূপ আয়তন, অনন্ত মহাসমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্য প্রবিষ্ট হইবে।" ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্র বাবুর এই "হৃদয়-কলসের" উপমাটা বড়ই সুযোগ্য হইয়াছে। ব্রহ্ম হইলেন অনন্ত সমুদ্র, আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একটা কলস। স্বর্গীয় মহাত্মা সাধক হরিনাথ মজুমদার বলিয়াছেন ঈশ্বর নিরাকার নহেন, 'নীরাকার'। জল যেমন যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ। ঈশ্বররূপ অনন্ত সমুদ্রও আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-কলসে প্রবেশ করিয়া দেশকালবদ্ধ আকার ধারণ করেন।* আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, সকলই দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে চিন্তা করি। আমাদের চিন্তামাত্রেই সাকার চিন্তা। সুতরাং ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে হইলেও দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে হইবে। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত মহাসমুদ্রের ফটোগ্রাফ্ তোল। সে ফটোগ্রাফ্ কি অনন্ত আকাশ ও অনন্ত

---

* নগেন্দ্র বাবু একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরজ্ঞানে আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের উপাসনা সাকার উপাসনা।" নব্যভারত—১২শ খণ্ড, ১০-১১ সংখ্যা, ৫২৪ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র লিখিয়াছেন, "মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়।" "মূর্ত্তি বলিলেই

মহাসমুদ্রকে সমগ্ররূপে প্রকাশ করিবে? কখনই না। ফটোগ্রাফের প্লেট্ (plate) সেই অনন্তের যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ, ও যে ভাবে, যে আকারে, যে বর্ণে ধারণ করিতে সমর্থ, সে কেবল তাহাই প্রকাশ করিবে। অনন্ত আকাশও অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সেই চতুষ্কোণাকৃতি প্লেটের উপর চতুষ্কোণ আকার ধারণ করিবে। অনন্ত ঈশ্বরকেও আমাদের হৃদয়ের ছাঁচে ঢালিতে হইলে, তিনি সাকার, সাবয়ব বলিয়া প্রতীত হন। সুতরাং অনন্তের মূর্ত্তি "ত্রিকোণ বৃত্ত, কাঁটালের আমসত্ব, সোণার পাথরের বাটী"র ন্যায় অসম্ভব নহে। আমরা সেই অনন্তকে চিন্তা করিতে গিয়া পরিমিত ভাবি।

অতএব অনন্ত ব্রহ্মকে যদি আমার ক্ষুদ্র হৃদয় দ্বারা ধরিতে না পারিলাম, তাঁহাকে যদি ধ্যান, ধারণা করিতে না পারিলাম, তবে তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে হইতে পারে? উপাসনায় অবশ্য ধ্যান, ধারণার প্রয়োজন। অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না বলিয়াই তাঁহার যে সকল ভাব আমরা আমা-

---

পরিমিত বুঝায়" এ কথা বলাও যাহা, "পরিমিত পদার্থমাত্রেরই মূর্ত্তি আছে" একথা বলাও তাহাই। এখন পরিমিত পদার্থমাত্রই যদি মূর্ত্তিবিশিষ্ট হয়, তবে আমার হৃদয়-কলসে ব্রহ্ম-সমুদ্রের যে টুকু প্রবেশ করেন, তাহা পরিমিত, সুতরাং মূর্ত্তিবিশিষ্ট। আমার হৃদয়ে ব্রহ্মের যতটুকু ধারণা করিতে পারি, তাহাই আমার উপাস্য; ব্রহ্মের যে সকল শক্তি ও গুণ আমার ধারণার অতীত, আমি তাহার উপাসনা করিতে পারি না। সুতরাং আমি হৃদয়-কলসে প্রবিষ্ট, আকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই কেবল উপাসনা করিতে পারি। আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা যদি সাকার উপাসনা হয়, তবে নিরাকারবাদীর ব্রহ্ম-উপাসনা ও সাকার উপাসনা হইল।—

দের হৃদয়-কলসে ধরিতে পারি, সেই সকল ধ্যান ও ধারণা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি। হৃদয়-কলস যে কয়েকটী ভাব ধরিতে পারে তাহা জমাট বাঁধিয়া (crystallizd.) ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি গঠিত হয়। ইহাই (হিন্দুর) ইষ্টদেবতা।

তোমার হৃদয়রূপ প্লেটে ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি গুণের ফটোগ্রাফ্ উঠিলে, তাহাতে যে মূর্ত্তি হইবে তাহা ব্রহ্মা। ঈশ্বরের জগৎ-পালকত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদির সমবায়ে যে মূর্ত্তি উঠিবে, তাহা বিষ্ণু। জগৎ-সংহারকত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি গুণের সমষ্টিতে যে মূর্ত্তি উঠিবে, তাহা রুদ্র। আবার মাতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, মঙ্গলভাব, পাপবিনাশেরভাব ইত্যাদি লইয়া যে মূর্ত্তি উঠিবে, তাহা দুর্গা। পিতৃত্ব, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মঙ্গলভাব, যোগৈশ্বর্য্যাদি লইয়া যে মূর্ত্তি গঠিত হইবে, তাহা শিব। এইরূপে অনন্তগুণবিশিষ্ট অনন্ত ঈশ্বরের যে কয়েকটী ভাব আমাদের হৃদয়-কলসে ধরা যাইতে পারে, কিংবা হৃদয়ক্ষেত্রে চিত্রিত হইতে পারে, তাহার সমবায়ে হিন্দুর উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। * কিন্তু এই সকল উপাস্য দেবতায় ও ঈশ্বরে কোনই ভেদ নাই। কলস মহাসমুদ্রে ডুবাইলে সেই কলস-মধ্যস্থিত জল ও সাগরের জলে যেমন কোন ভেদ থাকে না (কেবল উপাধিগত ভেদ), সেইরূপ এই সকল দেবদেবীর সহিত ঈশ্বরেরও কোন ভেদ নাই; কেবল উপাধি মাত্র, নাম মাত্র ভেদ। †

* সকলের হৃদয়ের একরূপ ভাব সমানরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না, সেইজন্য সদ্গুরুর দ্বারা ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়।

† দেবদেবীর মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু বলেন,— "এই আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথম ব্রাহ্মসমাজ হইতেই আরম্ভহয়"।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে ছোট করিও না। আপনাকে বড় কর। তোমার হৃদয়, মন, আত্মাকে প্রশস্ত কর। যতই তোমার হৃদয়, মন ও আত্মা প্রশস্ত হইবে, ততই অনন্তকাল পর্য্যন্ত, সেই অনন্ত পুরুষকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে ধারণ করিতে পারিবে। পিতা মহৎলোক। পুত্র তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পিতার মহত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়া কি সে এক জন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা বলিবে? মহাপণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। পিতার বিদ্যা বুদ্ধির কিছু বুঝে না বলিয়া কি সে একজন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা বলিবে?"

(৪৬ পৃষ্ঠা)

নগেন্দ্র বাবুর এ উপমা এখানে খাটে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সমুদ্রের মধ্যে কলস ডুবাইলে কলসের জল ও সমুদ্রের সহিত যেমন কোন ভেদ থাকে না, সেইরূপ হিন্দুর উপাস্য দেবদেবীর সহিত ঈশ্বরের কেন ভেদ নাই। সুতরাং ঈশ্বর "মহাপণ্ডিত" ও দেবদেবী "আর একজন সামান্য ব্যক্তি" নহেন। পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র তাহার পিতা হইতে "আর একজন সামান্য ব্যক্তিকে" পৃথক দেখে, কিন্তু হিন্দু উপাসকগণ ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ দেখেন, তাঁহাদের নিকট ইষ্ট দেবতাই ব্রহ্ম। নগেন্দ্র বাবুর যদি হিন্দুদিগের উপাসনার বিষয়ে

এ সম্বন্ধে অন্য আর এক বিখ্যাত ব্রাহ্মলেখক স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণ হিন্দুদেবদেবীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্রাহ্মপ্রচারকগণের "উদ্গার-ভক্ষণ" (!) করিতেছেন। কিন্তু এমত সম্পূর্ণ ভুল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কালীমূর্ত্তির যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে (ত্রয়োদশ উল্লাস ৪-১০ শ্লোক দেখ), স্কন্দপুরাণে যে শিবলিঙ্গের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে—, এ সকলও কি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ লিখিয়াছিলেন?

বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি এই সুরুচিসঙ্গত উপমা ব্যবহার করিতেন না।

তিনি অনন্ত ঈশ্বরকে ছোট করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত উপাসকের হৃদয় ক্ষুদ্র থাকিবে, ততদিন ছোট না করিয়া উপায় কি? আমার হৃদয়-কলসে যতটুকু ধরিবে, আমি তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া আমার হৃদয়-কলসের জলকে আমি মহাসমুদ্র হইতে পৃথক মনে করি না। হিন্দুগণ তাঁহাদের ইষ্ট দেবতামূর্ত্তিতে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করিয়া তাঁহারা পূজা করেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। নগেন্দ্র বাবু যে হৃদয় মন প্রশস্ত করার কথা বলেন, তাহা এইরূপ উপাসনা দ্বারাই হইয়া থাকে। সাধক দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উপাসনা করিতে করিতে, শেষে দেখিতে পারেন, তাঁহার উপাস্য দেবতা জগৎ-জোড়া, জগৎব্যাপী, জগন্ময়। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা বিশ্বরূপ, বিরাট্। তাঁহার ইষ্টদেবতা—

> "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ।
> বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ॥"

এই জন্য বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবতারই বিরাট্ মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।*

এখন আবার সেই কথা আসিয়া পড়িল। ঈশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি কি কবির কাব্য? ঈশ্বরের কি বাস্তবিক কোন মূর্ত্তি

* বিষ্ণুগীতায় বিষ্ণুর বিশ্বরূপের উল্লেখ আছে; শিবগীতায় শিবের, দেবীগীতায় ভগবতীর বিশ্বমূর্ত্তির উল্লেখ আছে।

আছে, না সে কেবল আমাদের মনের কল্পনা? ঈশ্বর কি কথনও সাকার মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন? বাইবেল্ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, মনুষ্য ঈশ্বরের অনুরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে "God created man in his *own* image"; ইহা একটী সার্ব্বভৌম সত্য। আমাদের শাস্ত্রেও আছে পিণ্ড (মনুষ্যদেহ) ও ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ব্যষ্টি-সমষ্টিগত ভেদ। মনুষ্য-দেহ একটী ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm)। মনুষ্য শরীর ও মূর্ত্তি যেমন কল্পনার জিনিস নহে, প্রতক্ষের বিষয়; ঈশ্বরের মূর্ত্তি ও সেইরূপ কাল্পনিক নহে, প্রত্যক্ষ্যের বিষয়। যে বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া নিরাকারবাদিগণ তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা চালাইতে চাহেন, ইহা সেই বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। নিম্নে ইহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম দেওয়া যাইতেছে।

শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি "তুরীয়", তিনি "ঈশ্বর", তিনি "হিরণ্যগর্ভ" এবং তিনি "বিরাট্"বা"বৈশ্বানর"। তুরীয়াবস্থা শুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা, ইহা গুণাতীত, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, "শান্ত, শিব, অদ্বৈত"। চৈতন্য যখন "অজ্ঞান" বা মায়া দ্বারা সংশ্লিষ্ট হন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা—তখন তিনি জগৎকারণ ঈশ্বর। মায়ার দুইটী শক্তি আছে, "আবরণ শক্তি" ও "বিক্ষেপ শক্তি"। মায়ার যে শক্তি দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত রহিয়াছে, তাহাকে আবরণ শক্তি বলে। যেমন রজ্জুস্থিত "অজ্ঞান" নিজ শক্তি দ্বারা সেই রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মায়, সেইরূপ যে শক্তি দ্বারা মায়া শুদ্ধ চৈতন্য পদার্থে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে

স্থূলতর ক্রমে এই জগতের অস্তিত্ববোধ জন্মায়, তাহাকে বিক্ষেপ শক্তি বলে। অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈতজ্ঞান জন্মায় কারণ অজ্ঞান বা মায়া। মায়ার তিনটী গুণ আছে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিক্ষেপ শক্তি হইতে চৈতন্যাশ্রয়ে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জগৎ ও তৎপরে স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম জগতের উপাদান আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পাঁচটী 'পঞ্চতন্মাত্র' অর্থাৎ মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা। এ সকল ক্রমে মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত দ্বারা সপ্তদশাবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর * রচিত হইয়াছে। লিঙ্গ শরীরের সমষ্টি সূক্ষ্মজগৎ। সূক্ষ্ম-জগদুপহিত চৈতন্যকে "হিরণ্যগর্ভ'' বা "সূত্রাত্মা" বলে। মায়ার অব্যক্ত অবস্থায় যিনি অপরিস্ফুট কারণ-দেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই মায়ার এই সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণতি হেতু, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া 'হিরণ্যগর্ভ' হইলেন। তৎপরে মায়ার আরও পরিণতি হইতে লাগিল; সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত ক্রমে আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই স্থূল পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হইল। এই স্থূল পঞ্চ মহাভূত ক্রমে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতে পরিণত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরও স্থূল শরীর ধারণ করিয়া, স্থূল জগতের অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাট্‌রূপ ধারণ করিলেন। †

* চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বুদ্ধি, মন; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই পাঁচটী বায়ু—এই সপ্তদশ অবয়ব।

† সূক্ষ্মদেহী হিরণ্যগর্ভ কিরূপে বিরাট্‌রূপ ধারণ করিলেন তাহা "পঞ্চদশী"তে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

ব্রহ্মের এই চারিটী অবস্থা হইলেও, তিনি যখন অখণ্ড, অবিভাজ্য, নির্ব্বিকার, তখন তিনি এই চারি অবস্থায়ই এক। তুরীয়াবস্থায় যিনি নিষ্ক্রিয়, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অদ্বৈত, চৈতন্যস্বরূপ; তিনিই কারণ-শরীর ধারণ করিলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা, ঈশ্বর; আবার সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিলে তিনি জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ; এবং স্থূলশরীর ধারণ করিলে তিনিই বিশ্বরূপ, বিরাট্ পুরুষ। চারি এক, এক চারি। ব্রহ্মের এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর প্রপঞ্চ সমষ্টিতে এক মহাপ্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে; তাহাই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব বা জগৎ। এই ব্রহ্মাণ্ড-শরীরধারী পুরুষ বিশ্বমূর্ত্তি, সাকার, সগুণ ঈশ্বর। এই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ যে প্রকৃতরূপে তাঁহার শরীর, কাব্য কবিত্বের রূপক শরীর নহে, ইহা পঞ্চদশীকার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন,—

> "পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্ব্বপুর্যথা।
> সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্য বপুস্তথা।" চিত্রদীপ—১৬৮।

তন্তু যেমন পটরূপে পরিণত হইলে, সেই পটকে তন্তুর শরীর বলা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া, এই বিশ্ব তাঁহার শরীর।

> "সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।
> সর্ব্বাহং মানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্॥
> প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্তয়ম্।
> লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে॥
> সর্ব্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ।
> সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্॥
> শস্যং বা শাকজাতং বা সর্ব্বতোঽঙ্কুরিতং যথা।
> কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ॥
> আতপাক্তাত-লোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ।
> শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট্॥"
>
> চিত্রদীপ। ২০০—২০৪।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, এই জড় জগৎ যদি ঈশ্বরের প্রকৃত শরীর হইল, তবে কি তিনি জড়ে পরিণত হইলেন? চৈতন্য পদার্থ কি জড়ে পরিণত হইতে পারেন? কখনই না। ঈশ্বর জড় জগতে পরিণত হন নাই। আমি যেমন চৈতন্য পদার্থ হইলেও, এই জড় শরীর ধারণ করিয়াছি, অথচ আমার আত্মা জড়ে পরিণত হয় নাই, সেইরূপ ঈশ্বর জড় শরীর ধারণ করিলেও জড়ে পরিণত হন নাই। তিনি জড়শরীর ধারণ করিয়াছেন 'বিবর্ত্ত' দ্বারা, 'বিকার' দ্বারা নহে। বিকার কাহাকে বলে? কোন বস্তু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করিলে, তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলে, ("স্বতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ")। যেমন দুগ্ধ নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘৃতে পরিণত হয়। বস্তুর নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য আকার ধারণ করাকে বিবর্ত্ত বলে, ("অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃত ইতি") যেমন, রজ্জু নিজের স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া সর্প বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মও নিজের চিদ্‌ঘনভাব পরিত্যাগ না করিয়া এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতীত হন।

মায়োপহিত চৈতন্যের যেরূপ তিনটী অবস্থা (ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্), জীবেরও সেইরূপ তিনটী অবস্থা আছে। জীব ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভেদ। * যেমন কতকগুলি বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বলা যায়, তাহার মধ্যে একটিকে বৃক্ষ বলা হয়; বাস্তবিক বন ও বৃক্ষ

* এতদ্ভিন্ন আরও একটী পার্থক্য আছে। ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন, তিনি মায়ার নিয়ন্তা; কিন্তু জীব মায়ার অধীন।

একই জিনিস; সেইরূপ চৈতন্যাধিষ্ঠিত অজ্ঞান বা মায়ার সমষ্টিকে "ঈশ্বর" ও চৈতন্যাধিষ্ঠিত মায়ার ব্যষ্টিকে প্রাজ্ঞ (জীব) বলে। সেই মায়া যখন আবার সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হইল, তখন সেই পঞ্চমহাভূতরচিত লিঙ্গশরীরের সমষ্টির (সূক্ষ্ম-জগতের) অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে যেমন হিরণ্যগর্ভ বলা যায়, কোন একটী বিশেষ লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে 'তৈজস' বলা হয়। স্থূলপঞ্চভূতরচিত স্থূলশরীর-সমষ্টির (স্থূলজগৎ) অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে যেমন "বিরাট্" বলা হয়, কোন একটী স্থূলশরীরের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে "বিশ্ব" বলা হয়। যেমন মায়া, সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত ও স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিকে এই ব্রহ্মাণ্ড বলে, ও ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌রূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ সাকার, সগুণ ব্রহ্ম; সেইরূপ অব্যক্ত মায়া (ব্যষ্টি), লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীরের সমষ্টিকে জীবদেহ বলা যায়, এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বরূপে তাহাদের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে জীব বলা যায়। এইরূপে ঈশ্বর ও জীবের সহিত সমান্তরাল রেখা টানিয়া দেখা গেল, জীবেরপক্ষে তাহার সাকার দেহ যেমন রূপক নহে, দ্বৈতজ্ঞানসম্ভূত প্রকৃত বস্তু; ঈশ্বরের পক্ষেও তাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি রূপক নহে, প্রকৃত বস্তু।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ব্রহ্ম কখনও স্থূলদেহধারী বিরাট্ পুরুষ, কখন সূক্ষ্মদেহধারী হিরণ্যগর্ভ; কখনও কারণদেহধারী ঈশ্বর; কখনও নির্গুণ, নিরবয়ব, চিন্ময়, "শান্ত, শিব, অদ্বৈত।" পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে তাঁহার নিজের এরূপ কোন অবস্থার ভেদ বা পরিবর্ত্তন নাই, তিনি স্বয়ং চারি এক বা এক চারি।

কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অবস্থার তারতম্য অনুসারে আমরা তাঁহাকে এই চারিভাবে জানিতে পারি। আমাদের জ্ঞানের তিনটী অবস্থা—"জাগ্রৎ," "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি।" আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায়, আমরা সাধারণ কথায় "জাগিয়া থাকি", অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করি। এই জাগ্রদবস্থায় আমরা ব্রহ্মের স্থূল মূর্ত্তি, বিরাট্‌রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। আমাদের স্বপ্নাবস্থায়, ইন্দ্রিয় সকল বিষয় ব্যাপার হইতে প্রতিসংহৃত হইয়া মনে লীন হয়, তখন মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত লইয়া ক্রিয়া করে। এই সময়ে যোগিগণ ব্রহ্মের সূক্ষ্মদেহ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। আমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় (গাঢ় নিদ্রার অবস্থায়), ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলই কেবল এক সূক্ষ্ম, অব্যক্ত প্রকৃতি-তত্ত্বে বা মায়াতে লীন হইয়া যায়। তখন যোগিগণ ব্রহ্মের কারণদেহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তাঁহার "তুরীয়" অবস্থা জ্ঞানের বিষয় নহে, উপাসনার বিষয়ও নহে। সে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব নাই, কোন ভেদ নাই; তখন সে অবস্থায় জীবের কোন জীবত্ব থাকে না, জীব শিব হইয়া যায়। এ অবস্থায় কোন উপাস্য উপাসক ভাব থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

* স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় ঈশ্বরোপাসনা উচ্চ অধিকারের কথা; আমরা স্থূল জগতে বিচরণশীল, সংসারবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব। আমাদের উপাস্য স্থূলদেহধারী বিরাট্‌রূপী ঈশ্বর, অথবা জগদ্ব্যাপী, জগ-

মূর্ত্তি, সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সগুণ, সাকার ব্রহ্ম। তাঁহার এই অনন্ত বিরাট্ মূর্ত্তি ও অনন্তগুণ ও ভাব আমাদের মনোবুদ্ধিতে (ক্ষুদ্রহৃদয়-কলসে) ধারণা হয় না বলিয়া আমরা তাঁহাকে পরিমিতভাবে উপাসনা করি। নিরাকারবাদিগণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে "জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, দয়াময়" বলিয়া ভাবেন; আর সাকারবাদিগণ তাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তির অন্তর্গত দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, দশভুজ প্রভৃতি মূর্ত্তিতে একাধারে তাঁহাকে "জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, দয়াময়"রূপে উপাসনা করেন। যেমন নীল, পীত, লোহিতাদি সপ্তবর্ণের সমষ্টিভূত শুভ্র সূর্য্য-কিরণ নীল, পীত, লোহিতবর্ণ-রঞ্জিত কাচনির্ম্মিত গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহমধ্যস্থব্যক্তির নয়নে কেবল নীল, পীত, লোহিত বর্ণে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ সাধকের প্রেমরাগরঞ্জিত হৃদয়ে সেই সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বাকার, সর্ব্বগুণের আধার, সহস্র-শীর্ষা, সহস্র-চক্ষু, সহস্রপাদ্ পুরুষ, কোন বিশেষ পরিমিত হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তিতে ও বিশেষবর্ণে প্রতিবিম্বিত হন। ঘাসের উপর পতিত শিশিরবিন্দু সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া দর্শকগণের অধিকৃত স্থান (angle) অনুসারে, কাহারও চক্ষে নীল, কাহারও চক্ষে পীত, কাহারও চক্ষে লোহিত, কাহারও চক্ষে ধূসর বর্ণে দৃষ্ট হয়; সেইরূপ এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বাকার, সর্ব্বময় ঈশ্বর ভক্তগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কাহারও নিকট পিতা, কাহারও নিকট মাতা, কাহারও নিকট প্রভু, কাহারও নিকট বন্ধুভাবে; অথবা অন্য ভাষায় কাহারও নিকট কৃষ্ণ, কাহারও নিকট শিব, কাহারও নিকট দুর্গা, কাহারও নিকট কালীরূপে

প্রতীয়মান হন। আর যোগিগণ কঠোর সাধনা, সংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রকে কামকলুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও শুভ্র করিয়া ধ্যান দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কল, শুভ্র, চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জলকণার ন্যায় সেই চিৎসমুদ্রে লীন হইয়া যান। তাই শ্রুতি বলেন,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নির্ম্মলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদোবিদুঃ॥"

"রজঃশূন্য এবং কলাশূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় পরম কোষে অবস্থিতি করিতেছেন। আত্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে শুভ্র এবং জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া জানিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, অনন্ত ব্রহ্মের মূর্ত্তি "ত্রিকোণ বৃত্ত, কাঁটালের আমসত্ব, সোনার পাথরবাটী"র ন্যায় অসম্ভব বস্তু নহে, তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ বিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি কবির কল্পনা নহে, তোমার আমার জড়দেহ যেমন দ্বৈতভাব-সম্ভূত বাস্তব পদার্থ, তাঁহার অনন্ত বিরাট্ মূর্ত্তি সেইরূপ প্রকৃত জিনিস। ইহা বেদের সিদ্ধান্ত, বেদান্ত দর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত।

নগেন্দ্র বাবুর কিন্তু ব্রহ্মের বিশ্বরূপ সম্বন্ধে আপত্তি আছে। তিনি বলেন,—

"যদি তিনি দেহধারী না হন, তবে তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয় কেন? এই জগৎ কি তাঁহার দেহ নহে? সাকারবাদী এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তদর্শন অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ বলিতেছেন;—"যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ সত্যরূপ বা ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন

না। এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম, বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া, প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখনকার পণ্ডিতেরা, লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্ত্তিমান্ করিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচর-যোগ্য করিয়া কহেন?" রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ; জগৎ রূপ-বিশিষ্ট। যাহা রূপবিশিষ্ট তাহা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের মনের অজ্ঞানতা মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বাস্তব সত্তা নাই; সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মের স্বরূপে নহে।"*

নগেন্দ্র বাবু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"এ জগৎ তাঁহার সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলেন, কিন্তু বিশ্বরূপ তাঁহার সাময়িক প্রকাশ মাত্র—তাঁহার সৃষ্টি লীলা। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। অন্তরে সচ্চিদানন্দ রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দেখা হয়।"

নগেন্দ্র বাবু ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তির সারমর্ম্ম এই। জগৎ ব্রহ্মের শরীর নহে, কারণ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ভ্রান্তি-জ্ঞান-সম্ভূত। আর বিশ্বরূপ তাঁহার সাময়িক প্রকাশ, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। এস্থলে ইহাঁরা উভয়েই একটী গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁরা

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

ধরিয়া লইয়াছেন, যে যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও নিত্য, চিরস্থায়ী ও ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বাস্তবিক তাহা কখনও নহে। জগৎকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া কেহ কখনও মানেন না। যাঁহার হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনিও জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে একথা জানেন। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ পদার্থ, জগৎ তাঁহার স্বরূপ নহে, ইহা কাহারও জানিবার বাকী নাই। আর ব্রহ্ম নিত্যপদার্থ বলিয়া তাঁহার শরীর যে জগৎ তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল হইবে এরূপ কোন বাধাবাধি আছে কি? ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এই মনুষ্যশরীরের সহিত জীবাত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। এই মানব-দেহ একটী ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm)। এবং মনুষ্য-দেহ সেই বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের একটী ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষের শরীর ক্ষণস্থায়ী, জীবাত্মার "সাময়িক প্রকাশ" বলিয়া কি সে শরীর মানুষের শরীর নহে? এই মনুষ্য-দেহ শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য রূপে—এমন কি সর্ব্বদা প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবের যখন দেহত্যাগ ঘটে, তখন প্রলয়কালীন জগতের ন্যায় এই শরীরেরও বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যা, পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী হইয়াও যদি এই শরীর মনুষ্যশরীর হইতে পারিল, তবে জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের শরীর হইতে পারিবে না কেন? প্রকৃত কথা এই যাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, যিনি এই চরাচর বিশ্ব

ব্রহ্মাণ্ডে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না, সেই মহাপুরুষের নিকট তাঁহার নিজের শরীরেরও যেমন কোন অস্তিত্ব-বোধ থাকে না, এই জগতের ও কোন সত্তা-বোধ থাকে না। কিন্তু তুমি আমি মায়া মোহের অধীন, দ্বৈতবুদ্ধি, সংসারী জীবের নিকট এই স্থূল শরীর ও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, এই শরীরের সুখ দুঃখে যেমন আমাদের সুখ দুঃখ বোধ হয়, সেইরূপ এই জগৎ ও আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদের নিকট জগৎ যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন বিশ্বরূপ বিরাট্ মূর্ত্তির উপাসনা করিবারও কোন প্রয়োজন থাকিবে না—তখন "শান্ত, শিব, অদ্বৈত," সচ্চিদানন্দ, তুরীয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বরের দেহ যদি অনিত্য, মিথ্যা হইল, তবে সাকারবাদিগণ কি মিথ্যা বস্তুর উপাসক? কখনই না। হিন্দু কখনও মূর্ত্তি পূজা করেন না, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের পূজা করেন। তুমি তোমার পিতার শরীরের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছ, তাহাতে কি সেই জড় শরীরকে প্রণাম করিতেছ, না শরীরধারী পিতাকে প্রণাম করিতেছ? নিরাকারবাদিগণ যেরূপ এই জগৎকে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী জানিয়াও সহস্র প্রকারে সেই মিথ্যা জগতের সাহায্যে ও অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করিতে চাহেন, সেইরূপ সাকারবাদিগণও এই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, এই মিথ্যা জগতের অবলম্বনে তাঁহাকে উপাসনা করেন। মোট কথা, এখানে নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী উভয়েই এক নৌকার আরোহী।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাঁহাদিগকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করি—পরমেশ্বর নিত্য, জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার, সত্য; জগৎ অসার, অসত্য। পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনশীল; জগৎ অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিব যে জগৎ ও ঈশ্বর এক,—তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?"

ইহার উত্তর অতি সহজ। এই জগতের অতীত তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই কে বলিল? তাঁহার চারিটি অবস্থার কথা একবার স্মরণ করুন। তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থায় জগতের অতীত। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ।১০।৪২

অর্থাৎ আমি কেবল এক অংশ দ্বারা এই নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছি। অর্থাৎ এই জগৎ ভিন্ন আমার আরও অংশ অর্থাৎ সত্তা আছে। (১) পরমেশ্বর ও জগৎ এই উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য বা বৈপরীত্য সত্ত্বেও তিনি কি প্রকারে জগৎ হইলেন? কেন, নগেন্দ্র বাবু কি রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত বিবর্ত্তবাদের কথা ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন? নিত্য, সত্য, স্থায়ী ব্রহ্ম, অনিত্য, মিথ্যা, অস্থায়ী জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন—বিবর্ত্তবাদ দ্বারা। রজ্জু যেমন সর্পরূপে পরিণত না হইয়াও সর্পাকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও নিজের স্বরূপ বজায় রাখিয়া আমাদের দ্বৈতবুদ্ধিতে, ভ্রান্তি-জ্ঞানে জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-নাশের কোন আশঙ্কা নাই।

(১) চণ্ডীতে ভগবতীকে "জগদংশভূতা" বলা হইয়াছে।

নগেন্দ্র বাবু আবার বলেন,—

"প্রহ্লাদচরিত্র যাত্রার হাতী দেখিলে, যে ব্যক্তি হাতী সাজিয়াছে, তাহাকে দেখা হয় না। এ জগৎ এই সকল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও সেইরূপ।" (১)

অর্থাৎ জগৎ দেখিলে ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখা হয় না। এ দৃশ্য মন্দ নহে—নগেন্দ্র বাবু জগৎ ব্রহ্মের মূর্ত্তি এইমত খণ্ডন করিতে গিয়া, নিজে যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডালই কাটিতেছেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"জড় জগৎ ঈশ্বর পূজার সাহায্য করে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এ উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। জগৎ ও জগদীশ্বর, এ উভয়ের মধ্যে অতি নিকট, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকরূপে, এই জগৎ জগদীশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—তাঁহার ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া দেয়। এই সুকৌশলসম্পন্ন, অত্যাশ্চর্য্য, সৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমজ্ঞান, ভূমা, মহান্, নিরবদ্য, সৌন্দর্য্যসার, পূর্ণ পুরুষের রচিত। তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলভাব সমগ্রভাবে সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত।"(২)

অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে, এই রূপরসাদিময় জগতে ব্রহ্মের শক্তিজ্ঞানাদি সমগ্রভাবে প্রকাশ পায়। তাহা হইলে, প্রহ্লাদ-চরিত্রের সেই হাতীটা দেখিয়া তাহার মধ্যস্থ মানুষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নগেন্দ্র বাবু এক মুহূর্ত্তেই হাঁ ও না বলিতেছেন।

নগেন্দ্র বাবুর আর একটি আপত্তি এই,—

(১) "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২০ পৃষ্ঠা।

(২) "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২১—২২ পৃষ্ঠা।

" এখন কেহ বলিতে পারেন যে পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ হইয়া ও তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না কেন ? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ রূপ ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? মানিলাম তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার চৈতন্যময় কিন্তু তাঁহার যখন শক্তির সীমা নাই, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে সাকাররূপে প্রকাশ পাইতে পারিবেন না কেন ? * * * এই আপত্তির উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কি বলিয়াছেন, দেখুন।—"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু যাহা স্বরূপনাশের সম্ভাবনা সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন।" * * * * রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে একরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না কেননা ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেইরূপ তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, একরূপ কথা বলিলে ব্রহ্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনা আছে, সে কখনও ব্রহ্ম নহে সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া আপনার স্বরূপের বিপর্য্যয় করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ।"

এখানে নগেন্দ্র বাবু ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উভয়ে আর একটী গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় বা নাশ ঘটে। ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপের নাশ না করিয়া

বিবর্ত্তদ্বারা এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন"। এখন জিজ্ঞাসা করি এই, অনন্ত সাকার মূর্ত্তির সমষ্টিভূত জগদাকারে প্রকাশিত হওয়াতে যদি ব্রহ্মের স্বরূপের ধ্বংস না হইল, তখন সেই জগতের অংশ যে একটী মূর্ত্তি তাহা ধারণ করিলে, তাঁহার স্বরূপের নাশ কেন হইবে? তিনি যেরূপ আত্মমায়া দ্বারা "বিবর্ত্তে" এই জগদাকারে প্রকাশিত হইতেছেন, সেইরূপ আত্মমায়া দ্বারা "বিবর্ত্তে" একটি বা ততোঽধিক মূর্ত্তি ও পরিগ্রহ করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপনাশের কোনই আশঙ্কা নাই। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" ৪।৬

জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা (সাকার মূর্ত্তিতে) আবির্ভূত হই।

নগেন্দ্রবাবুর আপত্তি যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ সেইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বশক্তিমান্ কি আত্মপ্রকাশে অক্ষম? যিনি সর্ব্বত্র স্থিতি করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্যের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন না? যদি বল পারেন না, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত কেমন করিয়া হইলেন? যদি বল পারেন, তাহা হইলে, অজ্ঞেয়তাবাদ কোথায় থাকিল?" *

* "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—১মখণ্ড, ২য় সংস্করণ,—৫৩ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্রবাবু এখানে বলিতেছেন, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন তিনি অবশ্যই আমাদের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন। জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করা ও প্রকাশ হওয়ার অর্থ কি? ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, আমাদের জ্ঞান দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং সাকার ভিন্ন হইতে পারে না। আমরা আকারের সহিত মিশ্রিত, মাখামাখি ভাবে ভিন্ন কিছুই চিন্তা করিতে পারি না। অতএব ব্রহ্ম যদি আমাদের জ্ঞানের ভূমিতে প্রকাশিত হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি সাকাররূপে প্রকাশিত হইবেন।

নগেন্দ্রবাবু তৎপরে বলেন,—

"নিরাকার ব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিলে, যে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় হয়, তদ্বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলেন—"যাহার মূর্ত্তিস্বীকার, কি ধ্যান, কিম্বা প্রত্যক্ষ করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত, এবং কাহার ও ব্যাপ্য নহেন""।

অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরকে ধ্যান কিংবা প্রত্যক্ষ করিলে তিনি পরিমিত হইলেন, তিনি আর অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম রহিলেননা। সুতরাং তাঁহার স্বরূপের নাশ হইল। এস্থলে নগেন্দ্র বাবুর সেই কলসীর উপমা স্মরণ করুন। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—

"পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন, তাহাতে কি? আমার হৃদয় যতটুকু, সেই পরিমাণে তাঁহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারিব। আমার হৃদয়-কলসের যতটুকু আয়তন, অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইবে।"

তাহা হইলে আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে ধ্যান কিংবা চিন্তা করিতে গেলে, তাঁহাকে পরিমিত করিয়া ফেলি। সুতরাং

নগেন্দ্র বাবুর মতে, ব্রহ্মের ধ্যান কিংবা চিন্তা করিলে তাঁহার স্বরূপের নাশ হইল! ব্রহ্মকে সাকার ভাবে চিন্তা করিলে যেরূপ তাঁহার স্বরূপের নাশ হইবে, নিরাকার (?) ভাবে চিন্তা করিলেও তাঁহার সেইরূপ স্বরূপের নাশ হইবে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"যদি এমনও কল্পনা করা যায় যে, পরমেশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া উপাসকের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে, ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষটী দেখা আর সেই প্রকাশিত মূর্ত্তি দেখা একই কথা। ঐ বৃক্ষটী ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে, আর সেই মূর্ত্তি ও ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট। উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ। ঐ বৃক্ষ নিত্যপদার্থ নহে, সেই মূর্ত্তি ও নিত্য পদার্থ নহে। ঐ বৃক্ষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে ; সেই মূর্ত্তির স্থায়িত্ব ও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের সত্তা রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তিতে ও পরমেশ্বরের সত্তা আছে। সুতরাং ঐ বৃক্ষটী দেখিলে, পরমেশ্বরকে যেমন দেখা হয়, যদি তিনি কোন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হন, সেই মূর্ত্তি দেখিলেও তাঁহাকে সেইরূপ দেখাই হয়। সৎ, চিৎ, আনন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার প্রকৃতদর্শন হয় না"। (২০—২১ পৃষ্ঠা)

সৎ, চিৎ, আনন্দ রূপে দর্শন করিলে, যদি ঈশ্বরের প্রকৃত দর্শন হয়, তবে তাহা এই আবির্ভূত মূর্ত্তিতেই হইয়া থাকে, অন্যরূপে হইতে পারে না। কারণ, নাম রূপ বাদ দিয়া সচ্চিদানন্দ নির্গুণ তুরীয় ব্রহ্মের কেহ কখনও দর্শন লাভ করিতে পারে না। সেরূপ জ্ঞান অসম্ভব। সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাধককে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভাব ছাড়িয়া যাইতে হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দর্শন বা জ্ঞান হইতে পারে না, তবে সাধক সেই ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হইতে পারেন। ব্রহ্মকে দেখিতে কিংবা জানিতে হইলে তাঁহাকে সগুণ, সাকার, স্বরূপ, সাবয়ব অবস্থায় দেখিতে বা জানিতে

হইবে। এখন যদি তিনি কৃপা করিয়া "আত্মমায়া" দ্বারা ভক্তের আরাধিত মূর্তির ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্মুখে আবির্ভূত হন, তবে সেই মূর্ত্তির সহিত নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত জড় বৃক্ষের আকাশ পাতাল ভেদ। কারণ বৃক্ষ জড়; সে মূর্ত্তি চৈতন্যময়। বৃক্ষে কেবল তাঁহার সত্তামাত্র প্রকাশ; সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার সৎ, চিৎ ও আনন্দ রূপ প্রকাশপায়। যেমন মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার সৎ, চিৎ ও আনন্দ ভাব দেদীপ্যমান্, সেই মূর্ত্তিতেও সেইরূপ। কারণ, যেখানেই তাঁহার এই রূপ আবির্ভাবের কথা শুনা যায়, সেখানেই তিনি ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের উৎস ঢালিয়া দিয়াছেন, সাধককে আশ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে বরাভয় প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, এগুলি ও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। নচেৎ সুবিধা মত একটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিলে চলিবে না।

"কোন দেবতা আদি কারণ ?"

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব জানেন, বিষ্ণু সকলের আদি। তাঁহা হইতে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা বিষ্ণুর অধীন ও আজ্ঞাকারী। শৈব বিশ্বাস করেন যে শিব সকলের আদি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;—ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা শিবের অধীন ও আজ্ঞাকারী। শাক্ত মনে করেন, শক্তি সকলের মূল। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই

শক্তি হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকল দেবতাই শক্তির অধীন ও আজ্ঞাকারী। হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে এই গুরুতর মত-বিরোধ বর্ত্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে যে বিরোধ দেখিতেছি, শাস্ত্রে ও সেই বিরোধ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিষ্ণুই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ।"

তৎপরে কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—

"যাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশাদি পরমেশ্বরের বিভিন্ন নাম রূপ মাত্র—সকল দেবতাই এক; যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব ইত্যাদি; পুরাণ পাঠ করিলেই তাঁহাদের কথা অশাস্ত্রীয়, অমূলক বলিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়"। (৩৫-৩৬। ৪০-৪১ পৃষ্ঠা)।

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন" ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই একমাত্র "অদ্বি-তীয় (১)," সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করেন। আজ কাল কোন কোন ব্রাহ্ম গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এদেশে তাঁহারাই "একেশ্বরবাদ" অর্থাৎ এক "অদ্বিতীয় ব্রহ্মের" উপাসনা প্রচলিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা নগেন্দ্র বাবুর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি শৈব শিবকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদি বলিয়া না মানিয়া বিষ্ণুকে সকলের (এমন কি শিবের ও) সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদি বলিয়া মানি-তেন, কিংবা বৈষ্ণব যদি বিষ্ণুকে আদি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া না মানিয়া শিবকে সকলের (এমন কি বিষ্ণুর ও) আদি বলিয়া

(১) এস্থলে নিরাকারবাদী যে অর্থে "অদ্বিতীয়" ব্যবহার করেন সেই অর্থে করা হইল।

মানিতেন ; তাহা হইলে শৈবকে শিবের উপরে, ও বৈষ্ণবকে বিষ্ণুর উপরে, অন্ত দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত। সুতরাং এক ঈশ্বরের উপরে অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইত ; তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে বহু ঈশ্বরের উপাসনা অনিবার্য্য হইত। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই যখন আপনার ইষ্ট দেবতাকে সকলের আদি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তখন সকলেই এক "অদ্বিতীয়" ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সর্ব্বসাধারণে এমন কি ইতর শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত জানে যে তাহাদের ইষ্ট দেবতা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সকলেই বলে "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি"। * এক ব্রহ্মই যে নাম ও রূপ ভেদে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি আকার ধারণ করেন, তাহা হিন্দুসমাজের সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটী সর্ব্বজনাদৃত গান ইহার প্রমাণ। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা, দে'মা দেখা, শ্রীরাধারে সঙ্গে নিয়ে॥
নরকরকটি বেড়া, ত্যাজে প'র মা পীতধড়া,
মাথায় প'র মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ দিয়ে।
ত্যাজিয়ে ভীষণ অসি, করে নে' মা মোহন বাঁশী,
বাজা মা হ'য়ে উল্লাসী জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে।

* পরমশ্রদ্ধাস্পদ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম বাবু রাজনারায়ণ বাবু বলেন—"বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রই সেই এক মাত্র পরম ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করিতেছে। সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি"। ব্রহ্মই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা"। দাসী, ১৬২, পৃষ্ঠা, ৪র্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

নরশির-মুণ্ডমালা ত্যা'জে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হ'মা কালা, হ্যাদে গো পাষাণীর মেয়ে॥"

"কে জানে তোমায় মায়া, ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারি॥
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর,
কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি
ছলনা করিয়ে ছলী, পাঠাইলে নাগপুরী।
জয় বলে রামরাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥"

এইত গেল সাধারণের বিশ্বাসের কথা। শাস্ত্রেও সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শৈব শাস্ত্র বলেন শিব সকলের আদি, অন্য দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন;—ইহার কারণ, শিবই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন, বিষ্ণু সকলের আদি ও অন্য দেবতার সৃষ্টি-কর্ত্তা, কারণ বিষ্ণু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। শাক্ত শাস্ত্র বলেন, শক্তি সকলের আদি, অন্য দেবতা তাঁহার অধীন, কারণ শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। গাণপত্যশাস্ত্র বলেন গণপতি সকলের আদি ও অন্য দেবতা তাঁহার অধীন, কারণ গণপতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সুতরাং সকল শাস্ত্রেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার উপাসনা প্রতিপাদন করিতেছে। শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি প্রভৃতি সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নামরূপের ভেদমাত্র। অন্য দেবতা তাঁহার অধীন বলায় "একেশ্বরবাদ" প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়

প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। নগেন্দ্র বাবু এই সকল দেবতার ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দারাই এই অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে নগেন্দ্র বাবু যে শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা,—

"ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বর শ্চৈব এব সঃ।
সর্ব্বেষাং পরমাতাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃপরঃ॥
ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশাশ্চ মহাবিরাট্।
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্র স্তস্যাংশঃ প্রকৃতিঃস্মৃতা॥"

"হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনিই সকলের পরমাত্মা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহাবিরাট্ ও ক্ষুদ্র বিরাট্ সকলেই তাঁহার অংশভূত।" (নগেন্দ্র বাবু কৃত অনুবাদ)

এখানে দেখিলাম সেই এক অদ্বিতীয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বায়ুপুরাণে বিষ্ণুকে স্তব করা হইতেছে,—

"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং।
জাগ্রৎস্বপ্ন-বিনির্ম্মুক্তং তং নমামি গদাধরম্॥"

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত, যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাত্রয়-বিনির্ম্মুক্ত সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

অতএব এখানেও বিষ্ণু পরমাত্মা।

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্তব করিতেছেন,—

"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

*　　*　　*　　*　　*

রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা
স্তেষন্তরাত্মাখ্য মতীবসূক্ষ্মম্॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি বিশেষণানাং
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥

*　　*　　*　　*

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভং।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্॥"

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি তীক্ষ্ণ চক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের হিতকর, ও জগতের মঙ্গল-সম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক, (বিষ্ণুরূপে)

স্থিতিতে পালন করিতেছ, এবং কল্পান্তে রুদ্র-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। * * * * এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎরূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানা প্রকার জীব জন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এবং এই জীবজন্তুগণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায়ই তোমার রূপভেদ। এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ কোন এক অচিন্ত্যরূপ আছে ("তুরীয়")। তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক রূপকে নমস্কার করি। * * * কোন পদার্থই যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। দেবগণ যাঁহার সূক্ষ্মরূপ নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতাররূপকে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।" ("হিন্দুত্ব" হইতে উদ্ধৃত শ্রীজগন্মোহন তর্কলঙ্কারের অনুবাদ)।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বাহুল্যভয়ে আর শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। এইরূপে আমরা দেখিলাম, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

শৈব শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে, শিব ব্রহ্ম। যথা শিবপুরাণে মহাদেব-স্তোত্র,—

"গুহাশয়ং বেদবিদো বিদুস্ত্বাং
অনন্তমাদ্যং বিবিধ-প্রকারং।
সৃজস্যদো বিশ্বমলোকলোকং
রজঃ সমাসাদ্য বিভো পরাত্মন্॥
অন্তঃ সমাসাদ্য চ সত্ত্বভাবং
বহিস্তমঃ সাদ্যচ নীলবর্ণং।
বিভূতিভি র্দৈত্য-বিদারিতাভিঃ
প্রজা ইমাঃ পাসি তথান্তরাত্মন্॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদজ্ঞব্যক্তিগণ তোমাকে হৃদয়-গুহানিবাসী, অনন্ত, আদ্য প্রভৃতি নানা ভাবে জানেন। হে বিভো, হে পরমাত্মন্! তুমি রজোগুণ অবলম্বন করিয়া চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাক। অন্তরে সত্ত্বভাব ও বাহিরে নীলবর্ণ তমোভাব ধারণ করিয়া, হে অন্তরাত্মন্! তুমি দৈত্য-বিধ্বংসকারী বিভূতি সকলের দ্বারা এই সকল প্রজা পালন করিয়া থাক।

শিবপুরাণের নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত বচন যথা—

"ভো! রক্তাঙ্গ! ব্রহ্মরূপী ভবাশু। জগৎ সর্ব্বং ত্বং রজসা ত্বং সৃজস্ব। অসৌ কৃষ্ণঃ পাতু এতত্তু সর্ব্বং। ত্রিভিগু র্ণৈশ্চাচ্ছাদিতোঽহং স্বশক্ত্যা।"

"মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্য্যে ও বিষ্ণুকে পালন কার্য্যে ভার দিয়াছিলেন। হে রক্তাঙ্গ! তুমি অচিরাৎ ব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক রজো-গুণ দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন কর। এবং এই কৃষ্ণ সমস্ত বিশ্বমণ্ডল রক্ষা করুন। আর আমি নিজশক্তি বলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলাম।" (নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ)।

শিব নিজ শক্তি বলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলেন, ইহার অর্থ কি? সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা (not differentiated) প্রকৃতি বা মায়া। সেই মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত যিনি, তিনি মায়োপাধি সগুণ ব্রহ্ম। অতএব এখানে শিব ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। তৎপরে নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের আজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন, এবং নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।"

"সংপূজ্যেনং সর্ব্বভূতান্তরস্থং
ব্রহ্মাচ্যুতৌ কৃতকৃত্যৌ তু ভূত্বা।

স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরেব:
তত্তদ্বাক্যং পালয়ামাস সর্ব্বম্॥"

এখানে স্পষ্টরূপে শিবকে সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিবস্তোত্র যথা,—

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

*   *   *   *

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥
মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তি মীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

যিনি দেবতাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহা হইতে দেবগণ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মহর্ষি (জ্ঞানময়) রুদ্র আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র গ্রীবা, তিনি সর্ব্ব ভূতের হৃদয়-গুহায় বাস করেন; ভগবান্ শিব সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি সর্ব্বগত, অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। সেই, অব্যয়, জ্যোতির্ম্ময়, মহান্ প্রভু, পুরুষ সর্ব্বপ্রাণীকে সুনির্ম্মল (পুণ্যের) পথে, প্রবর্ত্তন করেন; সে জন তাঁহার নাম ঈশান।

এ তদ্বারা শিব যে ব্রহ্ম তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। শিবগীতায় শিবের উক্তি যথা,—

"এক এব যতো লোকান্ বিসৃজামি সৃজামি চ।
বিবাসয়ামি গৃহ্ণামি তস্মাদেকোঽহমীশ্বরঃ॥
ন দ্বিতীয়ো যতস্তস্থে তুরীয়ং ব্রহ্ম যৎস্বয়ং।
ভূতান্যাত্মনি সংহৃত্য চৈকো রুদ্রো বসাম্যহম্॥
সর্ব্বলোকান্ যদীশেঽহমীশিনীভিশ্চ শক্তিভিঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশং চক্ষুরীশ্বরম্॥
ঈশানমীন্দ্রতস্থ যঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা।
ঈশানঃসর্ব্ববিদ্যানাং যদীশানস্তদস্ম্যহম্॥
সর্ব্বান্ ভাবান্ নিরীক্ষেঽহমাত্মজ্ঞানং নিরীক্ষয়ে।
যোগং চ সময়ে যস্মাদ্ ভগবান্ মহতো মতঃ॥
অজস্রং যচ্চ গৃহ্ণামি সৃজামি বিসৃজামি চ।
সর্ব্বাল্লোঁকান্ বাসয়ামি তেনাহং বৈ মহেশ্বরঃ॥
মহৎস্বাত্মজ্ঞানযোগৈ রৈশ্বর্য্যৈস্তু মহীয়তে।
সর্ব্বান্ ভাবান্ মহাদেবঃ সৃজত্যবতি সোঽস্ম্যহম্॥
এষোঽস্মি দেবঃ প্রদিশোঽপি সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হি জাতোঽস্ম্যহমেব গর্ভে।
অহং হি জাতশ্চ জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যগ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
স বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"

পঞ্চমঅধ্যায় ৩৭—৪৫।

"একমাত্র আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, সংহার, লোকান্তর-

প্রাপ্তি এবং অনুগ্রহ করিয়া থাকি। তাই আমি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছি। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই, আমি তুরীয় রুদ্র স্বরূপ, আমি ব্রহ্মরূপে ভূত সমুদায়কে আত্মাতে সংহৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি। যেহেতু মায়াশক্তি দ্বারা আমি সমস্ত লোককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছি, সেই কারণে আমাকে ঈশান বলে। তাই শ্রুতি ও আমাকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের ঈশান, সর্ব্বলোকদ্রষ্টা চক্ষু অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক, সত্তা-প্রদ বস্তু এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন। আমি স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর, অধিক কি আমি সমস্ত পদার্থেরই ঈশ্বররূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান্ আছি ; আমি সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, তাই আমি ঈশান নামে অভিহিত হইয়া থাকি। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমি মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানসাধনযোগ সমুদ্বোধন করি, এবং আমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছি ; তাই আমাকে ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমি এই সমস্ত লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি, আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর বলে। আমি আত্মজ্ঞান ও যোগগম্য বস্তু, আমি ঐশ্বর্য্য-শালী, এবং আমি সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি ও রক্ষা করি, তাই আমি ব্রাহ্মণাদির মধ্যে মহাদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। আমিই শ্রুতি-প্রতিপাদিত দেব, আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছি। আমিই পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছি, আমিই গর্ভে বর্ত্তমান্ আছি,এবং আমিই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া উৎপন্ন হইব। পরন্তু আমি সর্ব্বজনস্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বতোমুখ বলে। আবার আমিই সত্য,

জ্ঞান ও আনন্দ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি, তাই আমাকে প্রত্যক্‌-চৈতন্য বলিয়া থাকে। আমি বিশ্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বত্রচক্ষু, সর্ব্বত্রমুখ, সর্ব্বত্রবাহু, এবং সর্ব্বত্রপাদ বলিয়া থাকে। একমাত্র আমিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বাহু ও চরণ দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীস্থ পদার্থকে প্রেরণ করিতেছি।"

বলা বাহুল্য এতদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

এইরূপে শাক্ত শাস্ত্র সকলের মতে শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততংতস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ননস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যে দেবী সর্ব্ব ভূতের মধ্যে চেতনা নামে উক্ত হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতের মধ্যে বুদ্ধিরূপে আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

দেবীভাগবতে বিষ্ণু ভগবতীকে স্তব করিতেছেন,—

"সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ :
পঞ্চকৃত্যবিধাত্রৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমোনমঃ ॥
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমোনমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমোনমঃ ॥
বিস্তার্য্য সর্ব্বমখিলং সদসদ্‌বিকারং
সন্দর্শয়স্তবিকলং পুরুষায় কালে।
তত্ত্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব সপ্তভিশ্চ
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল বঞ্চনায় ॥"

৩ স্কন্ধ, ৪ অধ্যায়, ২৮।২৯।৩১

"যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় কারণ-স্বরূপা, সেই সচ্চিদানন্দ-রূপিনীকে প্রণাম করি। মাতঃ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, এবং নিজ সর্জ্জনীয়-নিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধাত্রী। অতএব হে ভুবনেশ্বরি! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। যিনি এই মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ (বিবর্ত্ত কারণ), সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা (প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা তুরীয়াবস্থা-প্রকাশক) হৃল্লেখাকে প্রণাম করি। জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহদাদি সপ্তবিকৃতি প্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ প্রভৃতি মূর্ত্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টিপঞ্চ ভূতময় এই জগৎকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃরূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জনকারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন। অতএব মাতঃ! আপনার এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদের বুদ্ধিতে ঠিক্ যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।"

দেবীভাগবতে এইরূপ সহস্র শ্লোক আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণপতিখণ্ড হইতে নগেন্দ্র বাবু এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,—

"সৃষ্টিপালনসংহারশক্তয়স্ত্রিবিধাশ্চ যাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং সা ত্বমেব নমোঽস্তুতে ॥
যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি স্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥"

"হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জন যে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এই ত্রিবিধ শক্তি ধারণ করেন, তুমি সেই শক্তিস্বরূপা। অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ এবং অগ্নি দহন করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি।" (নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ)।

এস্থলে দুর্গা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। "যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ"—ইহা নিম্নোক্ত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতির অবিকল অনুবাদ নহে কি ?

"ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥"

কঠোপনিষৎ ৩।৩

এইরূপে আমরা দেখিলাম শাক্ত শাস্ত্র সকলের মতে দুর্গা বা শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

যে স্থানে গণেশের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে গণেশ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশস্তোত্র,—

"ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং
নিরূপিতুমশক্তোঽহং মনিরূপমনুহকম্।
অব্যক্ত মক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্ ॥"

১৩ অধ্যায়।

হে গণপতে, তুমি ঈশ্বর, তুমি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তুমি সনাতন পুরুষ, তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। (কিন্তু তোমাকে কিরূপে স্তব করিব ?) তোমাকে নিরূপণ করিতে আমি অশক্ত ; তুমি তর্কের অগম্য ; তুমি অব্যক্ত, অক্ষয়, নিত্য, সত্য, পরমাত্মরূপী।

আর কত শাস্ত্র উদ্ধার করিব ? এইরূপ সহস্র সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে শৈব শাস্ত্রের মতে শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে বিষ্ণু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, শাক্ত শাস্ত্রের মতে শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, গাণপত শাস্ত্রের মতে গণপতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি প্রভৃতি হিন্দুর উপাস্য ইষ্টদেবতা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নাম ও রূপের ভেদ মাত্র। এক অদ্বিতীয়, সাকার, সগুণ, মায়োপাধিক চৈতন্যপদার্থই হিন্দুর ইষ্টদেবতারূপে উপাস্য। ইহা যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, উদারনীতি যুবকের সিদ্ধান্ত তাহা নহে। পঞ্চদশীকার বলিতেছেন,

"অন্তর্য্যামিনমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ।
সন্ত্যশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ॥
তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাং।
একৈব প্রতিপত্তিঃস্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুট মুচ্যতে॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথাসত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্॥"

চিত্রদীপ—১২৩-১২৫।

অর্থাৎ কেহ অন্তর্য্যামী (কারণ-দেহী ব্রহ্ম) কে ঈশ্বর বলে, কেহ হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বর বলে, কেহ বিরাট্‌কে ঈশ্বর বলে, কেহ ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলে, কেহ বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলে, কেহ শিবকে ঈশ্বর বলে, কেহ গণপতিকে ঈশ্বর বলে, কেহ বা অশ্বত্থ, অর্ক, বংশ প্রভৃতি বৃক্ষকে কুলদেবতা জানিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বলে। এইরূপে অন্তর্য্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর (বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ন্যায় ও আগম অনুসারে যাঁহারা বিচার করিবেন, তাঁহারা কেবল একটী মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। তাহা এখানে স্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে। "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, ও সেই মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ; সেই মহেশ্বরের মায়ার অবয়ব দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"—এই শ্রুতি অবলম্বন করিলে ন্যায্যরূপে ঈশ্বর-নির্ণয় হইবে। তাহা হইলে "অন্তর্য্যামী" হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বরবাদিগণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

নগেন্দ্র বাবুও যদি প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ন্যায় ও শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিতেন, তবে তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, শাস্ত্র সকলের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ দেখা গেলেও প্রকৃত কোন বিরোধ নাই। এক অদ্বিতীয় মায়োপাধি সাকার ব্রহ্মই যে সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন।

শৈবশাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতিকে শিবের অধীন, শাক্তশাস্ত্রে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে শক্তির অধীন, বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্রহ্মা,

শিব, শক্তি প্রভৃতিকে বিষ্ণুর অধীন বলার আরও একটী তাৎপর্য্য আছে। সকল সম্প্রদায়েরই মায়োপাধিক চৈতন্য বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একমাত্র উপাস্য। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী সূক্ষ্মদেহধারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ পভৃতি এক শ্রেণীর প্রাণী আছেন; তাঁহাদিগকে দেবযোনি বা দেবতা বলে। ইহাঁরা মনুষ্যের ন্যায় সৃষ্ট জীব, ও মনুষ্যের ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন। এ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রমাণ যথা —

"ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥"

কুলার্ণব, ১ম উল্লাস।

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত জীব কেবল বিনাশের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, অতএব সকলেই শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে।"

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বাবা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

"সলিল যেমন বাড়বানলের পশ্চাৎ ধাবমান্ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য প্রাণিগণ বিনাশেরই অনুধাবন করিতেছে।"

এই সকল দেবতা মনুষ্যের ন্যায় জন্ম মৃত্যুর অধীন বটেন, কিন্তু তাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী ও মনুষ্য স্থূলদেহধারী বলিয়া তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা ব্রহ্মের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইষ্টক ও কাষ্ঠ অপেক্ষা কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্যের কিরণ যেমন অধিকতর পরিষ্কাররূপে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ স্থূলদেহী মনুষ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহী দেবযোনিতে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ অধিকতররূপে প্রতি-

বিস্মিত হয়। অতএব ব্রহ্মের প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, এই সকল দেবতা আমাদের নিকট পূজনীয়।

এতদ্ভিন্ন আর একটী কথা আছে। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়, নির্গুণ, নিরুপাধি, তুরীয়, ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রকাশিত হন না; সে জন্য তিনি আমাদের উপাস্য নহেন। তাঁহাকে সাকার, সোপাধি, সগুণভাবে অবলম্বনের সাহায্যে উপাসনা করিতে হয়। অবলম্বনের মধ্যে আবার তারতম্য আছে। যেমন, জড় অবলম্বন অপেক্ষা মনুষ্য অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা সাধুভক্তের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, সাধুভক্তের অবলম্বন অপেক্ষা দেবতার অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, আবার সকল দেবতার মধ্যে যে সকল দেবতাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি, পালন, সংহার এই তিনটী সর্ব্ব প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কিংবা শক্তির অবলম্বন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপে যখন কোন উপাসক ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার রূপ অবলম্বনে উপাসনা করেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে পরমেশ্বরের প্রকাশ ভাবিয়া তাঁহার সহিত অভেদ জ্ঞানে উপাসনা করেন; তখন ব্রহ্মা অন্য দেবতার ন্যায় সৃষ্ট জীব, ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হইলেও, তিনি তখন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পদবীতে উন্নীত হন; সেই অবস্থায় ব্রহ্মাকে বিষ্ণু, রুদ্র, শক্তি, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়, তখন অন্যান্য দেবতা ব্রহ্মারূপী এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অধীন। এইরূপে উপাসক যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বর উপাসনা করেন, তখন বিষ্ণু অন্যান্য দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা রূপে বর্ণিত হন। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি শ্রেষ্ঠদেবতার কথা দূরে থাকুক, এই সংসা-

রের ক্ষুদ্র প্রাণী যখন সাধনাবলে ব্রহ্মকে সোঽহং ভাবে দেখিতে পারে, তখন সেও বলিতে পারে, আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি পালন-কর্ত্তা, আমি সংহার-কর্ত্তা—সকল দেবতা, মনুষ্য, সৃষ্ট প্রাণী মাত্রে আমার অধীন। একদিন দৈত্যকুমার প্রহ্লাদের এই পরিণতি ঘটিয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥"

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ ১৯।—৮৫।৮৬।

"সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয়। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয়, অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান্ ছিলাম, এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান্ থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।"

এইরূপ পরিণতি আর ঘটিয়াছিল ঋগ্বেদোক্ত অম্ভৃণ মহর্ষির বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী দুহিতার। তাই তিনি গাইয়াছিলেন,—

"অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরা
ম্যহ মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্য
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥" ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত।

আমি সমস্ত রুদ্ররূপে, সমস্ত বাসুরূপে বিচরণ করি, আমি অদিত্যগণ ও দেবতাগণ রূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী, আমি উপাসকগণের ধনদা, ইষ্টফলদাত্রী, ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকেই ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ করেন, উপাস্যদেবগণের মধ্যে আমিই প্রধানা। আমিই বহু আকারে বহু স্থলে বিরাজ করিতেছি। আমিই সর্ব্বভূতের মধ্যে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া আছি; এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যাহা কিছু করেন তাহা আমারই কার্য্য।

এইরূপপরিণতিপ্রাপ্ত প্রহ্লাদকে, কিংবা অম্ভৃণ ঋষির কন্যাকে ভক্তমাত্রেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিতে পারেন।

অতএব আমরা দেখিলাম,

হিন্দুর উপাস্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

হিন্দুগণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হিন্দু জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মগণ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অতীত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নির্ম্মল, নিষ্কাম, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তুরীয় ব্রহ্মে, সেই চিৎ-সাগরে বিলীন হইয়া যান। হিন্দুযোগিগণ কঠোর সাধনা বলে জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় উন্নীত হইয়া, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহধারী সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বরকে ধ্যানযোগদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। আর হিন্দু সংসারী ভক্ত গৃহস্থগণ জাগ্রদ-

বস্থায় বিদ্যমান্ থাকিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সাকার, সগুণ, জগদ্ব্যাপী, বিরাট্ মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ধ্যানোপযোগী ইষ্টদেবতামূর্ত্তিকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করেন। ব্রহ্মকে এইরূপে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন ভাবে দেখিতে এক হিন্দুই পারিয়াছেন, এক হিন্দুই পারেন। তুমি অন্ধ খ্রীষ্টান্ মিশনরিদিগের দেখাদেখি যাহাকে কুসংস্কারময় "পৌত্তলিকতা" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে যাও, তাহা সেই বিরাট্ মূর্ত্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা। তুমি যদি এই "পৌত্তলিকতা" কি জিনিস তাহা প্রকৃতরূপে অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে, তাহা হইলে তুমি ইহাকে এত দূর ঘৃণা করিতে না। এই "পৌত্তলিকতা" যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা, তাহা বুঝিতে তোমাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে না, যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হিন্দুগণ পূজা করেন, সেই মন্ত্রই ইহার প্রমাণ। ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে বসিয়া হিন্দু দেব, দেবী, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, আকাশ, পাতাল, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, ফুল, ফলের পূজা করেন কেন? না, এ সকল সেই বিরাট্ মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব—এই সকল অবয়বের দ্বারা সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম আমাদের নিকট প্রকাশিত। শিবপূজা করিতে গিয়া হিন্দু উপাসক ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি পূজা করেন কেন? না, সেই অষ্টমূর্ত্তি, বিশ্বমূর্ত্তি, বিরাটরূপী ব্রহ্মই তাঁহার উপাস্য। যাঁহারা হিন্দুর উপাসনা প্রণালী অনুসন্ধানের চক্ষে দেখিবেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর নগেন্দ্র বাবু বলেন,

"সমুদায় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, অল্পবুদ্ধি, মূর্খ লোকের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য বিবিধ দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।"

"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥"

"যে সকল মন্দবুদ্ধি মানব নির্গুণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ নহে, সবিশেষ কল্পনা দ্বারা সেই সমস্ত মূঢ়গণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা হইয়াছে।" (৪১ পৃষ্ঠা)

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, নগেন্দ্র বাবু নিজের মত সমর্থনের জন্য "অনুকল্পন্তে" কথার এক সময়েই "কল্পনা" অর্থ ও "অনুকম্পা" অর্থ করিলেন। আর নগেন্দ্র বাবু "মূঢ়", "মন্দবুদ্ধি," "মূর্খ" কথা ব্যবহার করিয়া দেখাইতে চান যে, যে সকল ব্যক্তির চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য দেবমূর্ত্তির আবশ্যক, তাহারা তাঁহার নিকট যেন কতই কৃপার পাত্র! কিন্তু এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে, তাঁহার সে ভ্রম দূর হইবে। অশিক্ষিত, বর্ব্বর ক-অক্ষর জ্ঞানহীন চাষা লোকের প্রতি দয়া করিয়া ঋষিগণ দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, আর তুমি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানালোকে আলোকিত, সভ্য, ভব্য ব্যক্তিমাত্রই ইচ্ছা করিলেই "নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের" সাক্ষাৎ করিতে পারি, সুতরাং প্রতিমাপূজা আমাদের জন্য নহে—উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ যদি নগেন্দ্র বাবু এইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি নিশ্চয়ই ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তুমি আমি চক্ষু মুদিলে

যাহা দেখিতে পাই, তাহা নিশ্চয়ই "নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম" নহে। "নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম" কি বস্তু তাহা তোমার আমার বুঝিবারও অধিকার নাই।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন,—

"সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচরং।
অসত্রিলোকীসন্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥
সমাধিযোগৈ স্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ র্নিবিকল্পৈ র্দেহাধ্যাসনবর্জ্জিতৈঃ॥"

তৃতীয় উল্লাস।

অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা (তুরীয়াবস্থা)ই নির্ব্বিশেষ অবস্থা। তাঁহার স্বরূপ সত্তামাত্র (অর্থাৎ তিনি আছেন এই মাত্র বোধ), নির্ব্বিশেষ (অর্থাৎ কিরূপ আছেন, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করা যায় না), এবং বাক্য ও মনের অগোচর; তাঁহাতে এই অসৎ জগৎ, সৎ, ও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার এই স্বরূপ, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত, নামজাত্যাদি-রহিত দেহে আত্মজ্ঞান-বর্জ্জিত (মহাত্মগণ) সমাধি-যোগ দ্বারা জানিতে পারেন।

"নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম" কি বস্তু, তাঁহার সাক্ষাৎকার করার অর্থ কি, তাঁহার সাক্ষাৎকার করিতে কে অধিকারী ইহা পাঠক এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ইহাও বুঝিতে পারিলেন, যে সকল অল্পবুদ্ধি, মূর্খ লোকের জন্য শাস্ত্র প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা সকলেই—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ, উপাধিধারী, সকলেই—এমন কি ব্রাহ্মসমাজের সকলেই তাহার অন্তর্গত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে, সেই সঙ্গে সাকার জগৎও চিন্তা করিতে হয়। জগৎ বাদ দিয়া আমরা কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিনা। আমাদের ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে জগতের সাকার ও সগুণ ভাব তাঁহাতে আরোপ করিতে হয়। আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার, নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তাঁহার নিরাকার স্বরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির অগোচর বলিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মকে "অবাঙ্মনস-গোচর" বলিয়াছেন। তবে কি মানুষ কখনও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারেনা? মানুষ কি কখনও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেনা? পারে বৈ কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকেনা। তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া যায়। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা যখন যোগিগণ নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তখন তাঁহার সহিত অতি অল্পই পার্থক্য থাকে। নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানী দ্বৈতজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া, এই সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মান অপমান, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব (relative idea) হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি বারংবার বলিতেছেন,—

"অশব্দ মস্পর্শমরূপ মব্যয়ং
তথাহ রসন্নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচাষ্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" কঠোপনিষৎ।

ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ-রহিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত। তিনি ক্ষয়রহিত, অব্যয়, অতি সূক্ষ্মতম যে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব, তিনি তাহার ও পরবর্ত্তী, সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

ব্রহ্ম দুর্দর্শ, কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম। তিনি প্রকৃতিজাত-বিষয় বিকারের জ্ঞান (দ্বৈতজ্ঞান) দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে লুকায়িত। তাঁহাকে সেই গুহার মধ্যে দেখিতে হইলে অনেক অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পুরাতন। সেই দেবতাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্ব মুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্ত মুত্তমম্॥
অব্যক্তাৎপরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥" কঠ।

"আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষা অভিমান্ উৎকৃষ্ট, অভিমান্ অপেক্ষা বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষা স্বয়ং আত্মা উৎকৃষ্ট—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ; তাঁহাকে জানিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।"

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদু রমৃতাস্তে ভবন্তি॥" কঠ।

ব্রহ্মের রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। চক্ষুদ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারে না। অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি ও মননরূপ সম্যগ্‌দর্শন দ্বারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাঁহাকে জানিতে পারে, সে অমৃত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ।
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ॥" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

সেই পরম দেবতাকে জানিলে সর্ব্বপাশ ছিন্ন হয়, ক্লেশ সকল বিদূরিত হয় ও জন্মমৃত্যু শেষ হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

হে মৈত্রেয়ি! সেই আত্মাকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে; তাঁহাকে দেখিতে পারিলে, শ্রবণ করিতে পারিলে ও ধ্যান করিতে পারিলে এই বিশ্ব জগৎ সকলই জানা হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

"বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥" প্রশ্নোপনিষৎ।

"হে সৌম্য। যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, প্রাণ

সমূহ এবং ভূতগণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হয়েন"—অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।"

"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াংসোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

"সেই পুরুষই বিশ্ব, কর্ম্ম, তপ, ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন, হে সৌম্য! তিনিই অবিদ্যাগ্রন্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্ন করেন—মুক্ত হন।"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" মুণ্ডকোপনিষৎ

যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লয় হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব-হীন হইয়া সেই পরাৎপর পরম পুরুষের স্বরূপে লীন হইয়া যান।

"স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি।"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

"যিনি সেই পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হয়েন। শোক পাপ উত্তীর্ণ হইয়া এবং হৃদয়গুহাগ্রন্থি সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব লাভ করেন।"—অর্থাৎ তাঁহার মুক্তি হয়।

নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপে রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য

উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ যখন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখা-নেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আবার সেখা-নেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি-বার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব, "আমিত্ব"(individuality) ছাড়িতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ কখনও কেহ বলিতে পারে না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি "আমি" থাকিব, ততক্ষণ আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিব না। আমিত্ব বর্জ্জন না করিতে পারিলে, সেই অখণ্ড, অনন্ত পুরুষকে জানা যায় না। আবার যখন তাঁহাকে জানা যায়, তখন আর আমার "আমিত্ব" থাকিতে পারে না। তখন "আমি" আর এক ব্রহ্ম হইয়া যায়। সুতরাং "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ বলা অসম্ভব। আর যিনি মনে করেন, "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—

> "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
> অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"

"যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি * ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস

---

* বলা বাহুল্য এস্থলে "আমি" শব্দ পারিভাষিক মাত্র। ইহা বুঝে নাই।

এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই ; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি" (নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য নাম ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া বা মুক্তিলাভ করা। মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের ব্রহ্মসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান, তাহা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জগৎ সংশ্লিষ্ট, সুতরাং সাকার।

নিরাকারবাদী বলেন, তাঁহার প্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মবাদ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তিনিও নাকি তাহাই প্রচার করেন। শ্রুতি যে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিও নাকি সেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। * কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ তাহা তিনি একবারও ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখেন না। শ্রৌত

---

* নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমর্থিত হইয়াছে কি না, যাঁহারা যথার্থই জানিতে চান, তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি, উপনিষৎ পাঠ করুন। একাদশখানি উপনিষৎ অমূল্য সত্যরত্নের ভাণ্ডার। বেদের শিরোভূষণ উপনিষৎ পাঠ করুন। আমি যতদূর জানি তাহাতে আপনাদিগকে বলিতে পারি যে পরমাত্মার স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ বিষয়ে উপনিষদে যেমন চমৎকার উপদেশ আছে, এমন আর কোথায়ও নাই।"

"যে বলে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা আধুনিক ব্যাপার, সে কেবল আপনার মূর্খতার পরিচয় দেয় এমন নহে; অথবা সে কেবল অলীক কথা বলিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করে এমন নহে; প্রাচীন ভারতের যাহা সর্ব্বপ্রধান গৌরব, তাহার প্রতি সে কুঠারাঘাত করে।"—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ, ১৬৬—১৬৮ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়। নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি সোজা; এমন কি আবালবৃদ্ধবনিতা, সর্ব্ব "সাধারণে"ই ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বড় সোজা বলিয়া বোধ হয় না। শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে, শ্রৌত ব্রহ্মোপাসনা করিবার পক্ষে, অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। এই অধিকার ভেদটা স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞাননিধি হইতে অন্য জাতিকে বঞ্চিত করিয়া তাহা নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইবার ফন্দীবিশেষ কিনা বলিতে পারি না। তবে এ কথা ঠিক, শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা কি জিনিষ তাহা যদি তুমি আমি বুঝিতে পারি, তবে আমরা তাহার বাড়ীর কাছ দিয়াও যাইতে চাহিব না। শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান যে অতি দুঃসাধ্য, দুর্ল্লভ পদার্থ, সকলের জ্ঞানের আয়ত্ব নহে, তাহা শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন,—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।" কঠ।

ব্রহ্মবিদ্যা বালকের নিকট, বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তির নিকট, কিংবা বিত্তমোহে মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না।

"শ্রবণায়াপি বহুভি র্যোন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" কঠ।

"যে পরমাত্মার কথা অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পায় না; এবং যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না, তাঁহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা বিরল; এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারেন এরূপ লোকও বিরল।"

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ॥" কঠ।

"সামান্য নরের শিক্ষায় বহু চিন্তা দ্বারাও সে পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। কেন না সেই পরমাত্মা অনুপ্রমাণ হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্কের অতীত।"

"না বিরতো দুশ্চরিতা ন্নাশান্তো ন সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" কঠ।

যে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ সে আত্মাকে পাইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়লৌল্যসম্পন্ন সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তবে কে তাঁহাকে পাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥" কঠ।

"কেবল বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃপুনঃ আলোচনা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। কেবল মেধা বা গ্রন্থার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের দ্বারাও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু সেই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। কেবল তাঁহারই নিকট আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন।"

এই সকল শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিলাম, যাহা শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান তাহা লাভ করিবার অধিকারী সর্ব্ব-সাধারণে হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ যে যে প্রণালীতে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞান কদাচ সে প্রণালীতে লাভ করা যাইতে পারে না। নিরা-কার ব্রহ্মজ্ঞান আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসাধারণের নিকট বক্তৃতার বিষয় নহে। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, এরূপ লোকও অতি বিরল। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বলিয়া বিশুদ্ধস্বরতাললয়সংযোগে গান করিলেই "অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্'' ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া অনর্গল, বহুক্ষণস্থায়ী, সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেই, সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই কথা (motto)-শোভিত ধ্বজা পতাকা উড়াইলে, কিংবা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কোলাহল করিলেই, অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে না। "জ্ঞান-চক্ষু," "বিশ্বাস-নয়ন" প্রভৃতি রূপকময় শব্দ ব্যবহার করিলেই, নিরাকার ব্রহ্মদর্শনোপযোগী জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। "সত্যং সত্যং সত্যম্'' কিংবা "জ্ঞানময়, শক্তিময়, প্রেমময়" প্রভৃতি-কথা, কিংবা তাহাদের অর্থ চিন্তা

করিলেই নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান হয় না। শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে কতটা কাঠখড়ের প্রয়োজন, তাহা শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া বেদান্ত বলিতেছেন,—

"অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"—বেদান্তসার।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কে? না, যিনি বিধিপূর্ব্বক (১) বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া, আপাততঃ অখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি ইহজন্মে কিংবা পূর্ব্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন পুর্ব্বক, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, যাগযজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পাপক্ষলন নিমিত্ত চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্ত, চিত্তের একাগ্রতালাভের জন্য সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিতান্ত নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, যিনি একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, ও অন্য সকল অনিত্য পদার্থ বলিয়া দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহকালে কিংবা পরকালে বিষয় ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি শম (২), দম

(১) অর্থাৎ অধ্যাপক মোক্ষমূলর, কিংবা তাঁহার শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ আমরা যেরূপ বেদপাঠ করি, সেরূপ নহে।

(২) যেমন তীব্র ক্ষুধা হইলে একমাত্র খাদ্যবস্তুর প্রতি ইচ্ছা জন্মে, অন্য কারণ বশতঃ কোন একটু বিলম্ব সহ্য হয়না, সেইরূপ যেগুণ অন্য বিষয় হইতে মনকে রুদ্ধ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মসাধনের (শ্রবণ, মননাদির) দিকে পরিচালিত করে, তাহার নাম শম।

(৩), উপরতি (৪), তিতিক্ষা (৫), সমাধান (৬), শ্রদ্ধা (৭), এই সকল গুণ-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহার মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে (৮), এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী।

যে মহাত্মা এই সকল গুণগ্রাম সম্পন্ন হইবেন, তিনি কি কখনও তোমার আমার ন্যায় সংসারে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন ? কখনই না। তাই বেদান্ত বলিতেছেন,—

"অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।"

যিনি এইরূপ অধিকারীর লক্ষণ বিশিষ্ট হইবেন, তিনি, যেরূপ কাহার ও মস্তকে আগুণ জ্বালিয়া দিলে, সে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রবলবেগে জলরাশির মধ্যে গিয়া

(৩) যে গুণের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল অন্য বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া একমাত্র ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত থাকে।

(৪) যে বৃত্তি দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে একমাত্র ব্রহ্মসাধনে নিরোধ করিয়া রাখা যায়। অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক পরিত্যাগ।

(৫) শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, স্তুতি নিন্দা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।

(৬) বিষয় হইতে নিগৃহীত মনের ব্রহ্মে সমাধি।

(৭) গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

(৮) আপত্তি হইতে পারে, মোক্ষলাভের ইচ্ছাত সকলেরই আছে, তাহা আবার জন্মিবে কি ? আর মোক্ষেচ্ছা একটা উপার্জ্জিত গুণের মধ্যেই বা কেন গণ্য হইবে ? বলা বাহুল্য মোক্ষলাভ কি, তাহা যিনি জানেন না, তাঁহার এইরূপ প্রশ্ন সম্ভব। বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ-রূপে নিবৃত্ত না হইলে কখনও মোক্ষেচ্ছা জন্মিতে পারে না।

পতিত হয়, সেইরূপ এই সংসার-অনল-সন্তপ্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর চরণতল আশ্রয় করিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে যে সকল সাধনের আবশ্যকতা বলা হইল, তাহা যে নিতান্ত অসাধ্য সাধন, অথবা লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ হইতে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়ার কৌশল বিশেষ (scarecrow), তাহা বলা যায় না। পুরাণ-ইতিহাসে পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণের সাধনপ্রণালী ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে এইরূপ ব্রহ্ম-সাধনার ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, শুকদেব,ব্যাস, সনৎকুমার প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবনী পাঠ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, এই সকল মনীষিগণ বিষয়-কামনা সকল হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আজীবন যম, নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি ধর্ম্মানুশীলন পূর্ব্বক কামনা-পরিশূন্য হইয়া কেবল সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মন বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিকে বিনাশ করিয়া অবশেষে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব-সম্পন্ন পরমাত্মাতে লীন হইয়াছিলেন। যদি পুরাণ ইতিহাসকে myth বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, দেও তাহাতে আপত্তি নাই। এই সকল তপস্তেজঃসম্পন্ন মনীষিগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিলেও, শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যেরূপ অশেষ ত্যাগস্বীকার, কঠোরইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও অসীমকৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক, এই সকল জীবন বৃত্তান্ত যে তাহার

উদাহরণ (concrete example) সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!" এই শ্রুতির অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন, নিরাকার ব্রহ্মকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়; তবে সাকার উপাসনার প্রয়োজন কি? যাহারা মূর্খ, তাহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনা বিধান করিয়াছেন। এস্থলে দুঃখের বিষয় এই যে, "কাণ টানিলে মাথা আসে" নগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতেছেন না। আত্মাকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়, যেন মানিলাম। কিন্তু তাহা কি তুমি আমি পারি? তাহা একমাত্র অধিকারী ব্যক্তি পারেন। যাঁহার সাকার, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে, তিনি পারেন। প্রথমতঃ সাকার উপাসনা করা ভিন্ন আত্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিতে পারে না। এই জন্য আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাকার উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা। সাকার উপাসনা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত অধিকারী ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে করিতে অবশেষে আত্ম-স্বরূপে লীন হইয়া যান। তাই সেই শ্রুতিই বলিতেছেন,—

"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

"ব্রহ্মকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে, সকলই জানা হয়"—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যান।*

---

* এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যে অবস্থায় নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা হইতেছে সিদ্ধাবস্থা। এতদ্ভিন্ন একটী সাধনা-

নিরাকার উপাসনা।

এই পুস্তকের প্রথমে বলা হইয়াছে, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না—ইহা শ্রুতির মত। কিন্তু এখন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নির্গুণ উপাসনার প্রণালীর কথা বলা হইল। কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে, এমন কি কোন কোন শ্রুতি দ্বারাও নির্গুণ উপাসনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এখন কথা হইতেছে, শাস্ত্রোক্ত নির্গুণ উপাসনা কি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা নহে? নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা না হইতে পারিলে, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকিবে কেন? শাস্ত্রীয় নির্গুণ উপাসনা কি, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্রবাবুর কথিত নিরাকার উপাসনা কি তাহা দেখা যাউক।

বস্থা আছে; তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা উপযোগী নিরাকার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়; কিন্তু তখন মানুষ ব্রহ্ম হইতে অনেক তফাৎ থাকে। যে সকল শ্রুতিতে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতালাভ কিংবা অমৃতত্বলাভ করে, এরূপ বলা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধাবস্থা লক্ষ্য করিয়া। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ ইত্যাদি" ও "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" প্রভৃতি শ্রুতিতে সাধনাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের সাধন ও নিরাকার উপাসনা শ্রুতিবিরুদ্ধ না হইয়া বরং শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইল।

ইহার উত্তর কঠিন নহে। শ্রুতি সাধনের যে অবস্থাতে কিংবা যেরূপ অধিকারে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সিদ্ধাবস্থা হইতে বড় তফাৎ নহে। পঞ্চদশীকার বলেন,—

"ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ।"

"নির্গুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধি নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥"

ধ্যানদীপ—১২২, ১২৬।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনা কি জিনিষ ও তাহা কি প্রণালীতে করিতে হয়, এ বিষয়ে অতি অল্পই বলিয়াছেন। সুতরাং "নিরাকার উপাসনা" বলিতে তিনি কি বুঝেন, ইহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টরূপে কিছু দেখা যায় না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"সাধনের প্রথম অবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎ-কার্য্যের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, মহাত্মাদিগের মহৎ জীবনের অনুশীলন, নাম-জপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চাবস্থায় সম্ভব। সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহির্জ্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্মসহবাস-সুখে পরিতৃপ্ত হন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

অর্থাৎ নির্গুণোপাসনা অতি উচ্চ অধিকারের কথা, তাহা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নির্গুণোপাসনা পরিপক হইলে "সবিকল্প সমাধি" লাভ হয় ও তৎপরে ক্রমশঃ অনায়াসে "নির্বিকল্প সমাধি" লাভ করা যায়।

অতএব আমরা দেখিলাম, শ্রুতি যে সাধনাবস্থায় আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ ও ধ্যান করিবার কথা বলেন,তাহা বহুজন্মব্যাপী ধর্ম্মানুশীলনের ফল, এবং তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই লাভ হইতে পারে, তাহা অনুষ্ঠানকালে সাধক সিদ্ধাবস্থা হইতে অতি অল্পদূরে থাকেন। প্রচলিত "নিরাকার উপাসনা" কদাচ এই শ্রুতি-প্রপাদিত নির্গুণোপাসনা নহে।

আর একটী কথা এখানি বলিয়া রাখি। আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতির সহিত "নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। ইহা অধ্যাত্মযোগের বিবৃতিতে স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইবে।

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন।" (২৫—২৬ পৃষ্ঠা)

এস্থলে নগেন্দ্র বাবু নিরাকার উপাসনার দুইটী অবস্থার কথা বলিয়াছেন। একটী "প্রথমাবস্থা" অপরটী "উচ্চাবস্থা''। "পৌত্তলিকতার" ভাষায় ইহাকে অধিকার-বিভাগ বলে। প্রথমা-বস্থার সাধককে মন্দাধিকারী ও উচ্চাবস্থার সাধককে উচ্চা-ধিকারী বা শ্রেষ্ঠাধিকারী বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, নগেন্দ্র বাবুর নিরাকার উপাসনা কি একবার দেখা যাউক। "সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বনের প্রয়োজন। জগৎ কার্য্যের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ; মহাত্মাদিগের জীবনের অনুশীলন, নাম জপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।" ইহা বোধ হইতেছে মন্দাধিকারী সাধকের আভ্যন্তরীণ (private) নিরাকার উপাসনা। কারণ, এতদ্ভিন্ন প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক একটী উপাসনা আছে, যাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। ইহাকে প্রকাশ্য উপাসনা (public prayer) বলা যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবু ইহার কথা কিছু বলেন নাই। কারণ, বোধ হয়, তাঁহার মতে ইহার সাধন সম্বন্ধে কোন উপকারিতা নাই। অথবা ইহা উদ্ধৃত অংশের "প্রভৃতি" কথার মধ্যে পড়িয়াছে। যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু এই প্রকাশ্য উপাসনার গুরুত্ব অনুভব করুন আর নাই করুন, সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণের মধ্যে কিন্তু ইহারই বিশেষ গুরুত্ব দেখা গিয়া থাকে। এমন অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ, নামজপাদির কোন আবশ্যকতা মনে করেন না। কেবল প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক উপাসনাই তাঁহাদের নিকট খাঁটি নিরাকার উপাসনা। এমন কি ব্রাহ্ম-

সমাজে ইহার এতদূর প্রাধান্য দেখা যায় যে, প্রচলিত নিরাকার উপাসনা বলিলে এই বক্তৃতামূলক উপাসনাই বুঝায়। সেই জন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, ("Brahmoism is Christianity without a Christ") অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্টবিহীন খ্রীষ্টধর্ম্ম। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক উপাসনা সম্বন্ধে যদি এ কথা খাটে, তবে নগেন্দ্র বাবুর প্রচারিত উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে যে, ইহা প্রতিমূর্ত্তিবিহীন সাকার উপাসনা। বোধ হয় সকলেই জানেন হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনায় "নামজপ" আছে, "শাস্ত্রপাঠ" আছে, "জগৎ কার্য্যের আলোচনা" আছে; "মহৎজীবনের অনুশীলন"ও অনেকে করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, হিন্দুর উপাসনায় আরও আছে,—ধ্যান, ধারণা, যম, নিয়ম ইত্যাদি; যদ্দ্বারা উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতাসাধন, একথা যদি ঠিক হয়, তবে তাহা ধ্যান, ধারণা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। বলা বাহুল্য ঈশ্বরকে "দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়" বলিয়া ভাবিলে তদ্দ্বারা জগতে ঈশ্বরের দয়া, প্রেম, জ্ঞান, মঙ্গলের কার্য্য চিন্তা করা হয়। সুতরাং তাহাতে জগৎকার্য্যের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না। ধ্যান কাহাকে বলে? ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বলেন,—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"—পাতঞ্জল দর্শন। ৩ পাদ, ২ সূত্র।

অর্থাৎ হৃদয়াদি কোন স্থানে কেবল একটী বিষয় নিশ্চলভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান। *

---

* বলা বাহুল্য, এই ধ্যান সাকার ধ্যান; কারণ, আমরা সাকার ভিন্ন

কিন্তু ঈশ্বরকে "দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়" ভাবিলে, তাঁহার যাবতীয় দয়ার কার্য্য, প্রেমের কার্য্য, জ্ঞানের কার্য্য, মঙ্গলের কার্য্য একটার পর আর একটা মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে; সুতরাং তাহা ধ্যান নহে ও তদ্দ্বারা চিত্তের একাগ্রতালাভ হইতে পারে না।

এখন নগেন্দ্র বাবু কথিত উচ্চাবস্থার ব্রহ্মোপাসনা কি দেখা যাউক। তিনি বলেন,—

"নিরলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চাবস্থায় সম্ভব সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্বভাবে ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহির্জ্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্ম সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥"

সাধনের উচ্চাবস্থায়—অধ্যাত্মযোগদ্বারা নির্গুণব্রহ্মের লাভ হয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এই আধ্যাত্মযোগেই শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা। অধ্যাত্মযোগ কি ও তাহা কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হয় ও তাহাকে নির্গুণোপাসনা কেন বলে, ইহা দেখা যাইতেছে। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনা

নিরাকার বস্তুর চিন্তা করিতে পারি না"। এতদ্ভিন্ন উচ্চাধিকারে যখন বৃত্তির নাশ হয়, তখন এক প্রকার ধ্যান আছে; তাহাকে নিরাকার ধ্যান বলা যাইতে পারে। এইরূপ ধ্যানের কথা গীতা বলিতেছেন,—"আত্মসংস্থং-মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।" ৬।২৫। "পরে মনকে সেই আত্মতত্ত্বে বিলীন করার চেষ্টা করিবে, তখন কোন প্রকার চিন্তা করিতে হয় না।

যাঁহারা কথায় কথায় নিরাকারের ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা একবার চিন্তা করা উচিত।"

এই অধ্যাত্মযোগ কিনা, নিরাকারবাদিগণের মধ্যে সেইরূপ উচ্চাধিকারী সাধক কেহ আছেন কি না, এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনা দ্বারা সেই উচ্চাবস্থায় উপনীত হওয়া যায় কি না, এ সকল স্বতন্ত্র কথা। ইহার বিচার পরে করা যাইবে।

অধ্যাত্মযোগের বিবরণ।

"অধ্যাত্মযোগ" কি? উল্লিখিত কঠোপনিষদ্ বাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, "বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতসঃ আত্মনি সমাধানম্।" অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয় হইতে চিত্তের সংযত করিয়া আত্মায় সমাধি করা। শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ কোথায় পাইলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত? না তাহা নহে। সেই কঠোপনিষদেই অন্যত্র আছে,—

> যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
> বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গগিতম্॥
> তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ও যখন বুদ্ধি ও বাহ্যবিষয়ে ব্যাপারশূন্য হয়, সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এইরূপ স্থির অচল ইন্দ্রিয় ধারণাকেই যোগ বলা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মযোগে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বহির্জ্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেবল এক পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। এই কথা সেই শ্রুতি অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।।"
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।।"

ইন্দ্রিয় হইতে রূপ রসাদি সূক্ষ্ম, রূপরসাদি হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা প্রকৃতি সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই, তিনিই সকলের চরম অবস্থা, তিনিই সকলের চরম গতি। তিনি সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশ্য নহেন। কেবল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্বনিরূপণক্ষম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। কি প্রণালীতে তাঁহাকে দর্শন করা যায়? তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শক্তিকে মনে সংযত করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে সংযত করিবে, মহত্তত্ত্বকে পরমাত্মায় সংযত করিবে। বলাবাহুল্য এই ইন্দ্রিয়াদি সংযমনই আধ্যাত্মযোগ বা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা। এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য কি একবার দেখা যাউক।

আমি চাহি সর্ব্বোপাধিশূন্য, নামরূপবিহীন, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে মিলিত হইতে। আমি জড় জগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ জড়জগৎ তাঁহার

স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—তিনি জড়জগতে "গূঢ়," অপ্রকাশিত আছেন। আমি মানসিক জগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ আমার মন তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া, জড়-জগতের চিত্র দ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলে। মোট কথা, আমার চিত্তবৃত্তির সাহায্যে আমি যেখানেই তাঁহাকে দেখিতে যাইব, সেখানেই তাঁহার সাকার ভিন্ন নিরাকার রূপ দেখিতে পারিব না। এমন কি যদিও তিনি আমার হৃদয়-কন্দরে বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পারিতেছি না,—কেবল আমার এই চিত্তের জন্য। তাঁহার স্বরূপদর্শনে আমার চিত্ত এক প্রধান অন্তরায়। আমার মন কেবলই বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে—আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল সর্ব্বদাই রূপ রসাদির সহিত গাঁথা রহিয়াছে,—আমি কিছুতেই তাহাদিগকে অন্যদিকে ফিরাইতে পারি না। এক রকম ধরিতে গেলে, সেই রূপরসাদি লইয়াই, আমার চক্ষু কর্ণের অস্তিত্ব। রূপ-রসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে,তাহাদের মন হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। আবার যতক্ষণ রূপরসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার নিরাকার ব্রহ্মদর্শনও হইবে না। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকলকে স্বস্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

'ইন্দ্রিয় সকলকে মনে লয় কর।'

করিলাম। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মকে জানিবার জন্য আমার ইন্দ্রিয়সংযমই যথেষ্ট হইল না। আমার গন্তব্য পথের এখনও

অনেক বাকী। যাহাতে রূপ রসের একটু নাম গন্ধও নাই, আমি চাহি সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল এখন আর বাহিরের দিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধাবমান হয় না বটে, ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত হওয়াতে বহির্জ্জগতের নব নব ভাব সকল আমার চিত্তপটে এখন আর অঙ্কিত হয় না বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্বসঞ্চিত ভাব সকল আমার স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এখনও আমি কোন কিছু চিন্তা করিতে বসিলে সেই সকল ভাবের আলোড়ন বিলোড়ন হইতে থাকে। এই সকল ভাব রূপরসাদির প্রতিকৃতি, ইহারা থাকিতে কথনও আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারিব না। ইহারা তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আমাকে সেই সকল চিত্র পুছিয়া ফেলিতে হইবে। তাই শ্রুতি আদেশ করিতেছেন,

'মনকেও লয় কর।'

মনকে লয় করিলাম। আমি এখন ইন্দ্রিয় শক্তিকে সংযত করিলাম, মনকে সংযত করিলাম, কিন্তু তবুও আমার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইল না। আমার অহংভাব, আমিত্ব, আমি বলিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব * এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই আমিত্ব বজায় থাকিতে, আমি সেই পরব্রহ্মে বিলীন হইতে পারিব না। অনন্ত পরমাত্মসাগরে আমি একটী ক্ষুদ্রতরঙ্গ; তরঙ্গের এই তরঙ্গত্ব থাকিতে সে সমুদ্রের অনন্তত্বে ডুবিতে পারিবে না। তরঙ্গকে সাগর হইতে হইলে, তাহার সেই তরঙ্গ নাম ছাড়িতে হইবে, বায়ু-বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য আমার

* শ্রুতিতে মনের পরই বুদ্ধি। সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটির মধ্যে "অভিমান" বা "অহঙ্কার" একটী স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমিত্ব বিসর্জ্জন করা আবশ্যক, অভিমান-সংযম করা আবশ্যক। আমিত্ব বিনষ্ট হইলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যে সাম্যের ধ্বজা উড়াইয়া একদিন ফরাসী জাতি নর-রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিল, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না। যে সাম্যের তান ধরিয়া আজ ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, আত্মকলহ ও স্বস্ব প্রধানতার অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ভস্মীভূত হওয়ার উপক্রম হইয়াছেন, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না। যে সাম্যের ফলে,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" গীতা।

পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মনুষ্য, পশু, পাপ পুণ্য সমস্তই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় দর্শন করিতে সমর্থ হন—তাহাই প্রকৃত সাম্য। প্রথমোক্ত সাম্য অহঙ্কার-মূলক; "তুমি যে মানুষ, আমিও সেই মানুষ—তোমার যে অধিকার, আমারও সেই অধিকার হওয়া উচিত,'' ইহাই সেই সাম্যের মূলমন্ত্র। শেষোক্ত সাম্য অহঙ্কার-বিনাশের ফল; "তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময়—আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই" এইরূপ জ্ঞানমূলক। ইহা "অভিমান" সংযমের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলাভের জন্য অভিমানকেও লয় করিতে হইবে।

কিন্তু জীবের আমিত্ব দূর হইলেই সে ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারে না, সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একত্ব, সাম্য সম্পাদিত হইলেও, সৃষ্ট ও স্রষ্টার প্রভেদ থাকিয়া যায়। এইজন্য যে শক্তি দ্বারা কর্ত্তা আর কার্য্যের

পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান্ থাকে, যে জ্ঞান থাকিলে জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, সেই "বুদ্ধি" বা "মহত্তত্ব"কে ও * সংযত করা আবশ্যক। এই বুদ্ধি বৃত্তিই (Finite consciousness) অভিমান (Self consciousness or ego) কে ব্রহ্মের (Divine Consciousness) সহিত সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বুদ্ধিকেও সংযত কর।"

এই বুদ্ধির পর আর একটী স্তর "অব্যক্ত" বা "প্রকৃতি"। প্রকৃতি সংসার বীজ-স্বরূপ—যেমন বটকণিকাস্থিত বটবৃক্ষ-শক্তি। ইহা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারণের আধারভূত। যখন জীব এই প্রকৃতিতে অবস্থান করে, তখন সে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, শিব, অদ্বৈত ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হয়। কিন্তু যদিও সে সৃষ্ট পদার্থের রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার সমীপে অগ্রসর হইয়াছে, তথাচ এখনও সে সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টা হইতে পারে নাই। প্রকৃতিস্তরে থাকিতে তাহার পুনর্ব্বার সংসারাভিমুখে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। বটবৃক্ষশক্তি হইতে বটবৃক্ষ জন্মিবার আশ্চর্য্য কি? এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন;—

"প্রকৃতিকেও লয় কর।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ইন্দ্রিয়ের লয়, মনের লয়, অভিমানের লয়, বুদ্ধির লয়, মহত্তত্ত্বের লয়, প্রকৃতির লয়—এই লয়ের পর লয়, এই জীবজগতের মহাপ্রলয় সংসাধন করিলে তবে মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে—ব্রহ্মে

* জীব বিশেষে বা ব্যষ্টিভাবে যাহা "বুদ্ধি," জগতে বা সমষ্টিভাবে তাহা "মহত্তত্ব।"

সমাধি করিতে পারে। অতএব যখন ব্রহ্মে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সমাধি করিতে পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন মায়ামোহাচ্ছন্ন জীব মায়ামোহ কাটাইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়। তণ্ডুল ও জলপূর্ণ ঘট হইতে তণ্ডুল উঠাইয়া লইলে জল থাকে; জল নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলে.ঘট একমাত্র আকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে—সেই ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে কেবল এক উপাধি ভেদে পৃথক্; বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের দেহত্যাগ হইলে,—সেই সান্ত আকাশ অনন্ত আকাশে, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, জীব শিব হইয়া যায়। যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে, ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সংযমন দ্বারা জীব এইরূপে জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সমাধি করিতে পারে, তাহাকেই অধ্যাত্মযোগ বলে। ইহা স্থান বিশেষে জ্ঞানমার্গ, জ্ঞানযোগ, বুদ্ধিযোগ, আত্মসমাধি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনের প্রথমপাদ, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়েও ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

এখন একবার পূর্ব্বকথিত জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তির কথা স্মরণ করা যউক। এই অধ্যাত্মযোগ কোন্ অবস্থার সাধনা? পূর্ব্বে * কথিত হইয়াছে আমাদের জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করি। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ব্যাপার হইতে প্রতি-সংহৃত হইয়া মনে লীন হয়; মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত লইয়া ক্রিয়া করে। আমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন,

* তৃতীয় অধ্যায় দেখ।

বুদ্ধি সকলই এক প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইয়া যায়; তখন থাকেন কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা। অতএব উল্লিখিত অধ্যাত্ম-যোগে, ইন্দ্রিয়লয় স্বপ্নাবস্থার সাধন, মন ও বুদ্ধির লয় সুষুপ্তি-অবস্থার সাধন। মন ও বুদ্ধি লয়ের পর যে সমাধি তাহাও সুষুপ্তি অবস্থার সাধন, কারণ সুষুপ্তির পর আর জ্ঞানের অবস্থা নাই। সেই সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মের চতুর্থাবস্থা বা তুরীয় ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। শ্রুতি এই আধ্যাত্মযোগের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন,—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

"হে জীবগণ! তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, বর সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি কর। যেমন ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য, সুধীগণ বলেন, এই ব্রহ্মজ্ঞানপথ সেইরূপ দুর্গম।" অতএব খবরদার! এ পথে যে সে লোক আসিওনা।

শ্রুতি এইরূপে অধ্যাত্মযোগের theory প্রকটিত করিলেন। তাহার practice বিধিবদ্ধ করিবার ভার পড়িল দার্শনিকদিগের উপর। তত্ত্বদর্শিঋষিগণ শ্রুতির আদেশ অনুসারে অধিকারী-ভেদে মানবচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই যোগ-মার্গের সাধন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে ষড়্‌দর্শনের উৎপত্তি হইল।

নির্গুণোপাসনার প্রণালী।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট "অধিকারী" * ভিন্ন এই সাধন মার্গে কাহার ও অধিকার নাই, ইহা সকল দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি না হইয়াছে, সাকার উপাসনা দ্বারা যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা লাভ না হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, জন, টাকাকড়ী, ঘরবাড়ী এ সকল নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর ইহাদের কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়মূল না হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধনে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হইয়াছে,—শাস্ত্র বলেন তাঁহার নির্গুণোপাসনায় অধিকার নাই। উক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট অধিকারী সাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বিশ্বাস কঠোর সাধনা বলে অন্তরে বদ্ধমূল-করিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে, আমিই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম এইরূপ চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়। † এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার পূর্ব্বে সাধককে "শ্রবণ," "মনন," "নিদিধ্যাসন" ও "সমাধি" এবং সমাধির অঙ্গভূত "যম," "নিয়ম," "আসন" "প্রাণায়াম," "প্রত্যাহার," "ধারণা," "ধ্যান" ও "সবিকল্প সমাধি" অভ্যাস করিতে হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলেন,—

---

* ১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† "এবমাচার্য্যোণাধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বংপদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেঽববোধিতেঽধিকারিণোঽহং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তসত্যস্বভাবপরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীতি অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি।—বেদান্তসার।

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে
জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ।" পাতঞ্জলদর্শন— ২।২৮

অর্থাৎ "যোগাঙ্গাদি (যমনিয়মাদি—"যমনিয়মাসন প্রাণয়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি —পাতঞ্জলদর্শন) অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজস্তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ, মৃত্যু ভয় এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যাই ক্ষয় হইয়া যায়। মানবগণ যেমন এক একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে, ততই অবিদ্যামল কাটিয়া যাইতে পারিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মা আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ এতদুভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই চিত্ত শুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।"

সমাধি দুই প্রকার "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।" সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার পদার্থের চিন্তা বা অনুভূতি থাকে। এই সমাধিদ্বারা শ্রুতিকথিতানুরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান ও বুদ্ধির সংযম হইয়া থাকে। এই সকল সংযমাবস্থাভেদে ইহা "সবিতর্ক," সবিচার "সানন্দ" ও "অস্মিতা-মাত্র" এই চারিভাগে বিভক্ত। ("বিতর্কবিচারানন্দা স্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ"—পাতঞ্জল দর্শন, ১ম পাদ, ১৭ সূত্র)। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা থাকে না। নির-লম্বভাবে তখন কেবল এক পরমাত্মাই জ্ঞান হইয়া থাকে। (তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরবলম্বনভাবম্প্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ"—পাতঞ্জলদর্শন ভাষ্য)।

এই সমাধি দ্বারা সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। তখন নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, জীবের মুক্তি হয়।

উল্লিখিত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল, শাস্ত্রীয় নির্গুণোপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ কি জিনিষ। শ্রুতিতে যাহাকে

অধ্যাত্মযোগ বলা হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রে তাহাকেই নির্গুণোপাসনা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্মযোগকে নির্গুণোপাসনা বলার কারণ নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা বা উপাসনা নহে; * তাহার কারণ এই সাধন প্রণালীতে সগুণ বা সাকার ঈশ্বরের (Personal God) উপাসনার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত অধিকারী সাধক কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদি নিরোধ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এইজন্য সাংখ্যদর্শনে "ঈশ্বর অসিদ্ধ" বলিয়া ঈশ্বরোপাসনার অনাবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাধন প্রণালীকে "আত্মোপাসনা" বলাই সঙ্গত। ইহা কদাচ ঈশ্বরোপাসনা নহে। এই সাধন প্রণালীকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!"

হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে (ঈশ্বরকে নহে) দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিবে, ধ্যান করিতে হইবে।"—অবশ্য মন বুদ্ধ্যাদি সগুণ অবলম্বনের সহিত বুঝিতে হইবে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"

আত্মাকেই প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর।

অতএব আমরা দেখিলাম, শাস্ত্রে যাহাকে নির্গুণোপাসনা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদিত "অধ্যাত্মযোগ";—তাহা

* উপাসনার কোন অবস্থাতেই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান বা উপাসনা হইতে পারে না। সমাধি অবস্থায়ও মন বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্ম জড়পদার্থ অবলম্বনে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় সুতরাং সেরূপ জ্ঞানও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরবলম্বভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু তখন আবার জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভাব থাকে না।

কদাচ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা নহে। ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, তাহা, "তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে" এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম অর্থ "শান্ত শিব অদ্বৈত তুরীয়" পদার্থ; তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। কারণ অধ্যাত্মযোগ দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বের পরবর্ত্তী সেই চতুর্থা-বস্থায় উপনীত হইলে উপাস্য উপাসক ভাব থাকেনা। সুতরাং এই শ্রুতির সহিত উল্লিখিত অধ্যাত্মযোগ-প্রতিপাদক শ্রুতির কোনই বিরোধ নাই।

এখন শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ, বা নিরাকার উপাসনার সহিত নিরাকারবাদীর প্রচারিত নিরাকার উপাসনার তুলনা করা যাউক। নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"আমরা পদার্থের গুণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। আকৃতি, বিস্তৃতি, বেগ, বর্ণ প্রভৃতি গুণভিন্ন জড়ের আর কিছুই জানি না। সেইরূপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ভিন্ন মনের আর কিছুই জানিনা। গুণাধার পদার্থকে আমরা জানিতে পারি না। সাকারকে জানি গুণ দ্বারা, নিরাকারকেও জানি গুণ দ্বারা। আসল চৈতন্যকেও জানিনা, আসল জড় যদি কিছু থাকে, তাহাকেও জানিনা। পরমেশ্বরকেও সেইরূপ তাঁহার গুণ দ্বারা জানি। গুণাতীত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গলভাব প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকি। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার পদার্থেই যখন আমাদের গুণগ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন?" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১ম খণ্ড,১১২—১২১ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবু নিজেই স্বীকার করিতেছেন, নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না। তাঁহার মতে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই নিরাকার উপাসনা। কিন্তু এদিকে শ্রুতি ও অন্যান্য

শাস্ত্রের মতে রূপ ও গুণের অতীত ব্রহ্মের উপাসনাই (অধ্যাত্ম-যোগ) নির্গুণ বা নিরাকার উপাসনা। উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা শাস্ত্রীয় নির্গুণোপাসনার যদি কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে পাঠক ইহা অনায়াসেই বুঝিবেন, নিরাকারবাদীর নিরাকার-উপাসনা কদাপি শ্রুতি-প্রতিপাদিত ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা নহে। "জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, শক্তিময়, দয়াময়" ঈশ্বরের উপাসনা কদাচ "অধ্যাত্মযোগ" নহে। সুতরাং নিরাকারবাদী অধ্যাত্মযোগ দ্বারা নিরলম্বভাবে ব্রহ্ম সহবাস লাভ করিতে যে আশা করেন, সে নিতান্ত অলীক স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। নিরাকারবাদিগণ তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত নিরাকার উপাসনা প্রচার করিতে গিয়া নির্গুণোপাসনা-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল যে উদ্ধৃত করেন, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। "জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, শক্তিময়, দয়াময়" ঈশ্বরের উপাসনা যে প্রকৃতপক্ষে সাকার উপাসনা—ঈশ্বরের জ্ঞান, মঙ্গল, শক্তি, দয়া আছে স্বীকার করিলে তাঁহার আকারও স্বীকার করিতে হইবে,—ঈশ্বরে যেরূপ গুণ আছে, সেরূপ আকারও আছে, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা করিতে হইলে তাঁহার আকারও চিন্তা করা হয়, ইহা ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে সে সকল যুক্তির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এইরূপ যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু কিরূপ কুতর্কজালে জড়িত হইয়াছেন, একবার দেখুন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন, ঈশ্বরের গুণ আছে স্বীকার করিলে আকারও স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের আকার স্বীকার না করিয়া তৎপ্রতি জ্ঞান, দয়া, শক্তি প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদের জ্ঞানের যতদূর সীমা, তাহাতে দয়া বলিলে অন্যের দুঃখে সহানুভূতি-জনিত নিজের দুঃখ ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য স্নায়বীয় ক্রিয়া (Nervous action) বুঝায়; সেই দয়া ঈশ্বরে আছে, স্বীকার করিলে তাঁহাতে স্নায়ু ও তৎসম্বলিত শরীর আছে স্বীকার করিতে হইবে। আবার আমাদের 'জ্ঞান' 'ইচ্ছা' প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া ও তৎসহকৃত মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি অঙ্গের ক্রিয়া ভিন্ন হইতে পারেনা। সুতরাং আমাদের জ্ঞানে (Experience) যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে 'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' বলিলে তাহার সঙ্গে তদনুরূপ শারীরিক ক্রিয়াও বুঝায়। অতএব ঈশ্বরের শরীর স্বীকার না করিলে তাঁহাকে আমরা "দয়াময়," "জ্ঞানময়," "ইচ্ছাময়" প্রভৃতি নামে ডাকিতে পারি না।

এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ বলেন,—

"শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মনুষ্যের মনে দয়া, প্রেম, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি যে কোন ভাব উত্তেজিত হউক না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার স্নায়বীয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া স্নায়বীয় ক্রিয়াই দয়া নহে। সেতারের তারে বিশেষ ভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে নানা প্রকার সুর ও রাগিণী উৎপন্ন হয়। তাই বলিয়া তারের সঞ্চালনকে সুর ও রাগিণী বলা উচিত নহে।" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় সংস্করণ, ১২৩।১২৪ পৃষ্ঠা।

এস্থলে নগেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, চূড়ামণি মহাশয়ের মতে স্নায়বীয় ক্রিয়াই দয়া, বা ঈশ্বরের জড় শরীরই ঈশ্বর। তিনি কিন্তু কদাপি তাহা বলেন নাই—তিনি বলেন, মানসিক-বৃত্তি ও স্নায়ু মস্তিষ্কাদি পৃথক্ জিনিষ, ঈশ্বর ও তাঁহার শরীর

পৃথক্‌, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অকাট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেতারের তার-সঞ্চালন কদাপি রাগরাগিণী নহে। কিন্তু রাগরাগিণী বাহির করিতে হইলে সেতারের তারের আবশ্যক। রাগরাগিণী বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেতারের তার বুঝাইবে। সেতারের তার ভিন্ন রাগরাগিণী (অবশ্য সেতারের সাহায্য) উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর সাকার বলিয়া না মানিলে, তাঁহাকে দয়াময় প্রভৃতি নামে ডাকা যায় না।

কেবল ইহাই নহে। নগেন্দ্র বাবু আবার কি বলিতেছেন দেখুন,—

"এখন একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে। যদি পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি দয়া, প্রভুত্ব প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইল, তবে প্রতিমাতে অথবা প্রতিমায় আবির্ভূত দেবতায় সেই সকল গুণ কেমন করিয়া আরোপ, করা হইবে? আর, ঐ সকল গুণ আরোপ ব্যতীত দেবপূজা কেমন করিয়া সম্পন্ন হইবে? * * * তর্কচূড়ামণি সাকার উপাসনা সমর্থন করিতে গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছেন। উপন্যাস-কথিত কালিদাসের ন্যায়, তর্কচূড়ামণি যে ডালে দাঁড়াইয়া আছেন, সেই ডালই কাটিতেছেন।"

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১২৮, পৃষ্ঠা।

এখানেও পূর্ব্বের যুক্তির ন্যায়, নগেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মতে ঈশ্বরে জ্ঞান, শক্তি, দয়া প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি স্বীকার করিলে, আকারও স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার আকার স্বীকার না করিলে, তৎপ্রতি এই সকল গুণ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। তর্কচূড়ামণি মহাশয় যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, দয়া প্রভৃতি গুণ স্বীকার করেন,

তেমন আকারও স্বীকার করেন। সাকার উপাসকগণ যেমন দেবতাকে দয়াময়, জ্ঞানময়, শক্তিময় বলিয়া পূজা করেন, তেমন দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বলিয়া ধ্যান করেন! দেবতার শরীর মানিব না, অথচ জ্ঞান, শক্তি, দয়া প্রভৃতি শরীরসংশ্রিত গুণ মানিব, এরূপ অসম্ভব কথার (Absurdity)র মধ্যে তাঁহারা যান না।

এক ডালে দাঁড়াইয়া সেই ডাল কাটার যে দৃষ্টান্ত নগেন্দ্র বাবু দিয়াছেন, তিনি তাহা নিজেই করিতেছেন, দেখুন। আমাদের জ্ঞানে যতদূর জানা যায়, তাহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা, দয়া প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া আনুষঙ্গিক শারীরিক ক্রিয়ার সহিত ছাড়া হইতে পারে না। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"তর্কচূড়ামণির যুক্তি এই যে, মানুষের পক্ষে যখন শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া হয় না, তখন পরমেশ্বরের পক্ষেও শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত কেমন করিয়া ইচ্ছা ও জ্ঞানের ক্রিয়া সম্ভব হইবে? আমি তোমাকে বলিলাম যে, হলধর খোঁড়া দুই বগলে লাঠি দিয়া চলে, তুমিও কেন সেইরূপ চল না? তুমি বলিলে, হলধর লাঠির সাহায্য ব্যতীত চলিতে অক্ষম, সুতরাং তাহার পক্ষে লাঠি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি সে প্রকার অক্ষম নহি, আমি কেন লাঠি ব্যবহার করিব? আমি বলিলাম, সে কি? হলধর মানুষ, তুমিও মানুষ; হলধরের গতিক্রিয়া, তোমারও গতিক্রিয়া; অতএব তাহার পক্ষে যখন লাঠি আবশ্যক, তোমার পক্ষেও কেন হইবে না? এ যুক্তিটি যেমন, তর্কচূড়ামণির যুক্তিও সেইরূপ। * * * * * আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় মস্তিষ্কাদির সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু পরিমিত দুর্ব্বল মানুষ পারে না বলিয়া, অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরও পারেন না?"—

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১২৫, ১২৬ পৃষ্ঠা

কিন্তু নগেন্দ্র বাবু অন্যত্র বলিতেছেন,—

"তর্কচূড়ামণি বলেন, জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব। সুতরাং ঐ সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু মানবীয় ভাব বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমরা কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমরা কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। মানবীয় বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য ভাবের সহিত আমাদের সম্পর্কও থাকিতে পারে না। উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্য ভাব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।"—১৩০ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি দাঁড়াইতেছে এইরূপ। তিনি এখানে বলিতেছেন, মানবীয় ভাব বা পার্থিব ভাব ছাড়া অন্য ভাব আমরা বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। এখন, ইহা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, শরীরের মধ্যে আত্মা, মস্তিষ্কের মধ্যে জ্ঞান, হৃদয়ের মধ্যে দয়া বা প্রেম ইত্যাদি; কেবল এ সকলই মানবীয় বা পার্থিব ভাব। শরীর ভিন্ন আত্মা, মস্তিষ্ক ভিন্ন জ্ঞান, হৃদয় ভিন্ন দয়া কখনও পার্থিব বা মানবীয় ভাব নহে। এরূপ অসদৃশ ভাব আমরা কখনও ভাবিতে বা বুঝিতে, এমন কি কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা মানবমাত্রেই "হলধর খোঁড়া" —আমরা শরীর রূপ লাঠির সাহায্য ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, দয়া, প্রেম, ইহার কিছুই শরীর ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং আমরা সকলেই যখন "হলধর খোঁড়া,"—আমাদের ঈশ্বর অবশ্যই "হলধর খোঁড়া" অর্থাৎ শরীরধারী হইবেন; কারণ নগেন্দ্র বাবু নিজেই বলিতেছেন, মানবীয় ভাব ভিন্ন অন্য ভাব আমাদের মনের সীমার বাহিরে; আমরা

তাহা জানিতে, বুঝিতে, ভাবিতে, এমন কি কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং এই সকল মানবীয় ভাব ছাড়া অন্য ভাবে ঈশ্বরকে জানা, ভাবা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। অতএব আমরা দেখিলাম, নগেন্দ্র বাবুর নিজের যুক্তি দ্বারাই তাঁহার অন্য যুক্তি খণ্ডিত হইল। তিনি যে ডালে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নিজ হাতে কাটিয়া দিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত নিরাকার উপাসনা কি ?

অনেক নিরাকারবাদী মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা সমর্থন করেন। অতএব মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আধুনিক নিরাকার উপাসনার সাপক্ষে কোন কথা আছে কিনা, দেখা আবশ্যক। কিন্তু তাহা দেখিবার পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কিরূপ প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা একটু বিচার করা যাউক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অতি আধুনিক গ্রন্থ। হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু বেদ ও অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্র গ্রন্থ সকল * যদি এক কথা বলেন, ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যদি তাহার বিপরীত কথা বলেন, তবে মহানির্ব্বাণতন্ত্র দাঁড়ান কোথায় ? দ্বিতীয় কথা এই যে, যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

---

* অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সাকার উপাসনার নিন্দাসূচক যে সকল কথা নগেন্দ্র বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার বিচার অন্যত্র করা হইল।

যায়, সেই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেই শিব, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি দেবতার পূজার বিধান ও উপাসনা প্রণালী বিস্তৃত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং নিরাকারবাদী যদি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে তৎপ্রচারিত শিব ও আদ্যাশক্তির সাকার উপাসনাও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় কথা এই, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় উল্লেখ আছে, তাহা প্রকৃতরূপে সাকার উপাসনা।

নিরাকারবাদিগণ উপনিষদের দোহাই দিয়া, যে নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেন, তাঁহাকে যে কেবল এক মাত্র যোগিগণ অধ্যাত্মযোগ বা সমাধিযোগ দ্বারা লাভ করিতে পারেন, তিনি যে "দয়াময়" "শক্তিময়," "জ্ঞানময়" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বোধ্য নহেন ("নির্ব্বিশেষ"), সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত "দয়াময়" "শক্তিময়," "জ্ঞানময়" ঈশ্বরের যে প্রণালীতে নিরাকার উপাসনা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য নহেন, ইহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তৃতীয় উল্লাসের প্রথমেই বলিতেছেন,—

জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদ্ বিশ্বময়ং পরং।
যথাতথ-স্বরূপেণ লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্‌মনসগোচরং।
অসত্ত্রিলোকী সন্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ নির্ব্বিকল্পৈ দেহাধ্যাসনবর্জ্জিতৈঃ॥
যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ জীবতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥

স্বরূপ-বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈ রাপ্তুমিচ্ছুনাং বিহিতং তত্র সাধনম্। তৃতীয় উল্লাস।

হে মহেশ্বরি! সচ্চিদানন্দ বিশ্বময় পরব্রহ্মকে দুই প্রকারে জানা যায়। প্রথমতঃ স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা, ও দ্বিতীয়তঃ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা। তাঁহার স্বরূপ অবস্থায় তিনি কেবল সৎস্বরূপে উপলব্ধ হন, তখন তাঁহাকে কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তখন তিনি বাক্য মনের অগোচর; তদবলম্বনে এই অসৎ জগৎ সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার এই স্বরূপ অবস্থা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বর (Relative idea) অতীত, নাম জাত্যাদিরহিত, দেহে আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত যোগিগণ সমাধি যোগ (নির্ব্বিকল্প সমাধি) দ্বারা জানিতে পারেন। আর তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে তাঁহাকে জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে জানিতে হয়, অর্থাৎ তিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এই জগতের পালনকর্ত্তা, ও তিনি এই জগতের সংহারকর্ত্তা এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হয়। বস্তুতঃ তিনি এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া এই স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও সেই তাঁহাকেই জানা হয়। যাঁহারা তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত সাধনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করা হইল।

ইহার পরে জগৎ-সংশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কি প্রণালীতে উপাসনা করিতে হয়, তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের প্রণালী, পূজার পদ্ধতি, গায়ত্রী, ধ্যান, জপ, স্তব প্রভৃতি বিস্তাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জগৎ সংশ্লিষ্ট ভাবে ঈশ্বরচিন্তা যে সাকার চিন্তা, জগতের সহিত তাঁহাকে ভাবিতে হইলে জগতের নাম ও রূপ তাঁহাতে আরোপিত করিয়া যে তাঁহাকে চিন্তা করা ভিন্ন চলে না, জগতের মধ্যে ঈশ্বর উপাসনা যে সাকার উপাসনা, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে সে সকল যুক্তির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আর এক কথা এই, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যে প্রণালীতে করিবার উপদেশ রহিয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে নিরাকার উপাসনার অধিকারীকে সদ্‌গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সে নিরাকার উপাসনায় মন্ত্র-উচ্চারণ, গায়ত্রী-জপ, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি প্রচলিত সাকার উপাসনার সর্ব্বপ্রকার অঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু নিরাকারবাদিগণ সে সকলকে পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণা করেন। সুতরাং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত তথা-কথিত নিরাকার ব্রহ্মকে প্রোটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টান্‌দিগের অনুকরণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া তাঁহারা মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনার ফললাভে কি প্রকারে আশা করিতে পারেন?

এইরূপে আমরা এই অধ্যায়ে দেখিলাম, শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র-প্রতিপাদিত নিরাকার বা নির্গুণোপাসনার অর্থ অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা আত্মার সমাধি-করা। সেই সমাধি দ্বারা যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয়, তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। শাস্ত্রীয় নিরাকার উপাসনা সগুণ ঈশ্বরের (Personal God) উপাসনা নহে।

সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে নির্গুণোপাসনার অধিকার জন্মে। সগুণ উপাসনা ও শমদম প্রভৃতি সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে নির্গুণোপাসনার জন্য চিত্তভূমি প্রস্তুত হয়। সর্ব্বসাধারণে এই নির্গুণ উপাসনার কদাচ অধিকারী হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান কি জিনিষ, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রুতি বলেন, নিরাকার ব্রহ্মের কথা "অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পারে না; এবং তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না। তাঁহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা অতি বিরল এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারেন, এরূপ লোকও বিরল।" "সামান্য নরের শিক্ষায় বহুচিন্তা দ্বারাও সে পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই।" অতএব শাস্ত্র যদি সত্য হয়, শ্রুতি যদি সত্য হয়, তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনা কদাচ শ্রুতিপ্রতিপাদিত নির্গুণ উপাসনা নহে। কোন নিরাকারবাদী শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিবার অধিকারী কি না, তাহা তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের কথা। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের প্রকাশ্য উপাসনা, বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রবন্ধাদিতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং সচরাচর দেখা যায়, তাঁহারা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষার কোন ধার ধারেন না, এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনাঙ্গকে কুসংস্কারমূলক বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "জ্ঞানযোগ" "অধ্যাত্মযোগ" প্রভৃতি

বড় বড় কথা অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার অর্থ বা গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কেবল আমাদের সরল, স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে; তাহাতে চিত্ত-শুদ্ধির কোনই আবশ্যকতা নাই। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, নগেন্দ্র বাবু "শাস্ত্রপাঠ" "নামজপ" "জগৎ কার্য্যের আলোচনা" "মহৎজীবনে অনুশীলন" প্রভৃতি যে সকল নিম্ন অঙ্গের সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, সে সকল প্রতিমাপূজা-শূন্য সাকার উপা-সনা, শাসশূন্য খোঁস, তদ্দ্বারা উচ্চাধিকারে উঠিবার, এমন কি চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের একাগ্রতা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপে আমরা দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপা-সনার সহিত শাস্ত্রীয় নির্গুণ উপাসনার কোনই সংশ্রব নাই। নিরাকারবাদিগণ যে প্রণালীতে নিরাকার উপাসনা করেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত উপাসনা জ্ঞানমার্গের হিসাবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পর অধ্যায়ে দেখাইব, ইহাকে ভক্তিমার্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহা অকিঞ্চিৎকর (failure)।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে মোক্ষ-লাভ করিতে হইলে, শ্রুতির আদেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়কে মনে লয় করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিতে হইবে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে লয় করিতে হইবে, প্রকৃতিকে ব্রহ্মে লয় করিতে হইবে। এই লয়ের পর লয়, জীব-জগতের এই মহাপ্রলয় সংসাধন করিলে তবে জীব ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। কিন্তু এই লয় যে কত কঠোর সাধনা ও উগ্রতপস্যা দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রোক্ত মুনি ঋষিগণের জীবনী পাঠ করিলে জানা যায়। স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন,—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"

মনীষিগণ বলেন, এই জ্ঞানমার্গ শাণিতক্ষুরধারাসমাকীর্ণ পথের ন্যায় বড়ই দুর্গম। এই জন্য সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাপি কেহ এই দুর্গম পথের অধিকারী হইতে পারেন; আবার সহস্র সহস্র অধিকারীর মধ্যেও কদাচিৎ কেহ এই পথে কৃতকার্য্য হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারেন। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপিসিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ॥"

হাজার হাজার মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে, আবার সহস্র সহস্র যত্নশীল লোকের মধ্যে

কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা (জ্ঞানযোগদ্বারা) জানিতে পারে।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

শত শত জন্ম সাধনার পরে তবে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাকে পাইতে পারেন। "বাসুদেব সর্ব্বময়" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে মুক্তি হয়; কিন্তু যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

অতএব এই কঠোর সাধনমার্গ যদি কেবল লক্ষের মধ্যে একটীর উপযোগী হইল, তবে অবশিষ্ট লোকের উপায় কি? তোমার আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়ী, তপোজ্ঞানহীন লোকের কি কোন উপায় নাই? অবশ্যই আছে। পরম উদার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পরমজ্ঞানী যোগী সাধককে আশ্রয় দিয়াছেন, সেইরূপ ঘোরসংসারীকেও ক্রোড় পাতিয়া দিয়াছেন। পরম কারুণিক ভগবান্ জ্ঞানি-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই চরণতলে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। কেবল তাহাই নহে, গীতায় ভগবান্ সাধনের সুগমতার জন্য জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের আসন উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন,—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥" ১২।১।

হে ভগবন্! যাঁহারা (একাদশ অধ্যায়ে কথিত) তোমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সাকার, সগুণ ঈশ্বর রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, না যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তোমার

অব্যক্ত, অক্ষর রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ * ? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁহারা পরমশ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাতে মন সমর্পণ করিয়া (ভক্তিযোগের দ্বারা) নিত্যযোগযুক্ত হইয়া আমার (সাকার রূপের) উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে উৎকৃষ্টতর যোগী। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তি সকলকে সম্পূর্ণরূপে সংযমন বা নিরোধ করিয়া, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রবিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর রূপের উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূতের হিত অনুষ্ঠানে রত মহাত্মগণ (জ্ঞানযোগিগণ) আমাকেই প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু (আমার সাকাররূপের যাঁহারা উপাসনা করেন, সেই উল্লিখিত ভক্তযোগিগণ অপেক্ষা) এই নির্গুণোপাসকদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। কারণ, অক্ষর,

* গীতা হইতে উদ্ধৃত এই কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদে যাঁহাদের সন্দেহ হইবে, তাঁহাদিগকে শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকা পড়িতে অনুরোধ করি।

অব্যয় রূপের উপাসকদিগের একেবারেই দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে হয়; তাহাতে তাঁহাদের নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়।

এস্থলে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, যখন জ্ঞানযোগিগণ এত কষ্টকর সাধনা করেন, তখন তাঁহাদের ফলও অধিকতর হইবে। ভক্তযোগিগণ কি তাঁহাদিগের ন্যায় মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্ ॥"

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই সকল মৎসমর্পিতচিত্ত ভক্তদিগকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, অর্থাৎ তাঁহারাও মোক্ষলাভ করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ময্যেব মন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাতে (সাকার ঈশ্বরে) মন সমর্পণ কর, আমার প্রতি বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই স্থায়িভাবে পাইবে।

গীতার এই ভগবদুক্তিতে আমরা সাকার উপাসনার মূলতত্ত্ব পাইতেছি ও সাকার উপাসনার সহিত নির্গুণোপাসনার পার্থক্য কি, তাহাও দেখিতে পাই।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গের অধিকারী

হইতে হইলে সাকার উপাসনার প্রয়োজন; এখানে ভগবান বলিতেছেন, ভক্তিমার্গ বা সাকার উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভ পর্য্যন্তও হইতে পারে। অতএব যে পথেই যাওয়া যাউক না কেন, সাকার উপাসনা ভিন্ন গতি নাই।

এখন দেখা যাউক, সেই সাকার উপাসনা কাহাকে বলে ?

ব্রহ্মে নাম ও রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য, দেহ ও মনের তদুদ্দেশ্যে যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহাকে সাকার উপাসনা বলে। নির্গুণোপাসক ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া জানেন, সগুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না; সাকার উপাসকের নিকট সগুণ, সাকার ঈশ্বর (Personal God) ই একমাত্র উপাস্য। নির্গুণোপাসকের নিকট ব্রহ্ম এক অখণ্ড, অনন্ত, চৈতন্য পদার্থ; সাকারোপাসক ব্রহ্মে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। নির্গুণোপাসকের লক্ষ্য নিস্তরঙ্গ-সাগরবৎ প্রশান্ত, নামরূপাদিবিকাররহিত, নির্গুণ, নিরাকার, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মায় লীন হওয়া। সাকার উপাসকের লক্ষ্য জগৎ-সংশ্লিষ্ট, জগতের নাম রূপাদি সর্ব্বপ্রকার গুণবিশিষ্ট, সগুণ, সাকার, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লীলাময় ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া। নির্গুণোপাসনার মূলমন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে লয় করা; সাকার উপাসনার মূল-মন্ত্র সে সকলকে লয় না করিয়া তাহাদের বিষয়ীভূত সগুণ সাকার ঈশ্বরে তাহাদিগকে সমর্পণ করা। নির্গুণোপাসনা সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ,—

"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।"

ইন্দ্রিয় শক্তিকে মনে লয় কর, মনকে বুদ্ধিতে লয় কর। সগুণোপাসনা সম্বন্ধে গীতায় ভগবানের উপদেশ,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।"

অর্থাৎ আমাতে (সগুণ ঈশ্বরে) মন অর্পণ কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। নির্গুণোপাসক রূপরসাদিবিকারময় জগৎ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরে নিবেশ করেন; সাকার উপাসক জগতের মধ্যে সর্ব্ব রূপ ও গুণের আধার ভগবানের লীলাবিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করেন। নির্গুণোপাসক রূপরসাদি বিকার পদার্থের প্রতিবিম্ব হইতে মনকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া বুদ্ধিতে সংযত করেন; সাকার উপাসক হৃদয়পদ্মে ভগবানের মন-প্রাণ-বিমোহন অসীমলাবণ্যময় স্বপ্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় চারুমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হন। নির্গুণোপাসকের অদ্বৈতবুদ্ধিতে রূপ-রসাদি প্রপঞ্চময় জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে; সাকার উপাসকের দ্বৈতজ্ঞানে জগতের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ রহিয়াছে। নির্গুণোপাসক জড়জগতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন, সাকার উপাসক জড়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, জড়ের সাহায্যে,চৈতন্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। নির্গুণোপাসক নাম ও রূপকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; সাকার উপাসক তাহাদিগের আপাততঃ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে তাহাদের সহিত মিলিতভাবে ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করেন। নির্গুণ সাধনা অন্তর্মুখীন; সাকার সাধনা বহির্ম্মুখীন। নির্গুণোপাসনার প্রণালী বিশেষ হইতে সামান্যে উন্নতি (Inductive); সাকার উপাসনা সামান্য

হইতে বিশেষে পরিণতি (Deducttive)। নির্গুণোপাসনা জ্ঞান-বৃত্তি (Knowledge) মূলক ; সগুণোপাসনা ভাববৃত্তি (Feeling) মূলক।

(দ্বিতীয় অধ্যায়ে Knowing (জ্ঞান), Feeling (অনুভূতি) ও Willing (ইচ্ছাশক্তি)র যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একবার এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই Knowing, Feeling ও Willing তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। Knowing অর্থে জ্ঞানলাভ, অর্থাৎ যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অবস্থাবোধ। যাহা সৎ বা সত্য, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার নিরূপণ। সাধারণ দ্বৈতবুদ্ধিতে, জড়পদার্থের অস্তিত্ব আছে ; সুতরাং জড়পদার্থের জ্ঞানলাভ বলিলে, তাহার আকার, বর্ণ, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি অবস্থার নিরূপণ। কিন্তু অদ্বৈত বুদ্ধিতে কেবল একটী বস্তুর অস্তিত্ব আছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক, মায়াবিজৃম্ভিত। তাহার পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব কেবল আত্মায়। এই মিথ্যা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া কেবল আত্মাকে সত্যস্বরূপ জানাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ। ইহাই পূর্ব্বব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ। সুতরাং দ্বৈতজ্ঞান-সম্ভূত জড়পদার্থের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া অখণ্ড, অদ্বৈত চৈতন্য পদার্থের জ্ঞান পর্য্যন্ত, আমাদের অন্তরে নিহিত (Inborn) এক জ্ঞানশক্তিরই কার্য্য। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানযোগ আমাদের জ্ঞান-শক্তির (Knowledge) এক বিস্তৃত, বিরাট সম্প্রসারণ।)

(Feeling এর অর্থ অনুভূতি ; সুখদুঃখাদিবোধ।) আমা-

দের কতকগুলি অনুভূতি সুখদায়ক ; যেমন, দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি। আর কতকগুলি দুঃখদায়ক ; যেমন, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি ।) যে গুলি চিত্তের সুখজনক, তাহাতে চিত্ত আসক্ত হইয়া থাকে ; আর যে গুলি ক্লেশকর, তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে। কিন্তু সকল লোকের চিত্ত সমান উপাদানে গঠিত নহে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুণের মধ্যে কাহারও চিত্তে কোন একটী প্রবল থাকে। যাঁহার চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহার যে বিষয়ে সুখ বোধ হয়, যাহার চিত্তে রজোগুণ ও তমোগুণ-প্রধান, তাহার সে বিষয়ে সুখবোধ হয় না। আবার যাহার চিত্ত রজোগুণ প্রধান, তাহার যে বিষয়ে সুখবোধ হয়, সত্ত্বপ্রধান ও তমঃপ্রধান চিত্তে তাহা সুখকর নহে।) এক- ৬

জন রজোগুণপ্রধান ইংরেজ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শীকারের জন্য বনে জঙ্গলে বাঘ, ভালুকের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া নিরতিশয় সুখকর মনে করেন ; কিন্তু তাঁহাকে যদি এক ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে গির্জ্জায় বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে বলা হয়, তখন তাঁহার ভয়ানক কষ্ট বোধ হইবে। কিছু দিন হইল, কলিকাতার কোন গির্জ্জার একজন প্রচারকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কোন ইংরেজ ভদ্রলোক খবরের কাগজে লিখিয়াছিলেন,—উক্ত প্রচারকের অপরাধ তিনি ঠিক ১৫ মিনিটের অধিককাল ব্যাপিয়া এক দীর্ঘ (?) Sermon দিয়াছিলেন,—গির্জ্জা-ঘরে টানাপাখার তলে যে ভয়ানক গরম, তাহাতে ১৫ মিনিটের অধিককাল ধর্ম্মকথা শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইবে কেন? যাহা হউক, এই রজোগুণপ্রধান ইংরেজের যে সাত্ত্বিক ক্রিয়াতে ভয়ানক কষ্ট বোধ হয়, একজন সাত্ত্বিক-প্রকৃতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ

তাহাতে পরম সুখ বোধ করেন। এইরূপ লোকের প্রকৃতি অনুসারে সুখদুঃখজনক পদার্থের ভেদ হইয়া থাকে। যে যে প্রকৃতির লোক, সেই প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থ সুখকর, তাহাতে তাহার আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

অনুভূতির আসক্তিজনকতা যেরূপ একটী গুণ, উহা সেই রূপ লোকের আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। উহার মাদকতায় মুগ্ধ হইয়া লোক চৈতন্য হারায়। উহার যখন উত্তেজনা হয়, তখন অন্যান্য চিত্তবৃত্তি সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের শরীরে যখন একটী গুরুতর আঘাত লাগে, তখন আমরা সেই আঘাতের পীড়ায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ি যে, অন্য কোন বিষয়ের অনুভূতি বা জ্ঞান থাকে না। আমাদের কোন একটা যন্ত্রণাদায়ক পীড়া উপস্থিত হইলে, আমরা অন্য কোন বিষয় ভাবিতে কিংবা কিছু করিতে পারি না। এইত গেল শারীরিক অনুভূতির কথা। আমাদের মানসিক অনুভূতির মাদকতা আরও বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ, এই সকল অনুভূতির উত্তেজনায় লোকে কি না করিয়া থাকে? কত সময় কত লোকে জীবনের মায়া ভুলিয়া, শত শত বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিয়া, সামাজিক ও পারত্রিক দণ্ডকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, এই অনুভূতির উত্তেজনায় কত অপকর্ম্মই না করিয়া থাকে। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, লোকে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাও এই অনুভূতির উত্তেজনায়। পৃথিবীতে যে সকল দয়াবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর নিজের স্বার্থ বলি দিয়া পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাও এই অনুভূতির উত্তেজনায়।

যত প্রকার Feeling (অনুভূতি) আছে, তাহার মধ্যে

স্নেহ বা প্রেমের বল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অনুভূতির যে প্রধান দুইটী গুণ, আসক্তি ও মাদকতা, তাহা এই প্রেমে যেরূপ তীব্রভাবে জন্মিয়া থাকে, এরূপ আর কোন অনুভূতিতেই জন্মে না। এই প্রেম সংসারে পিতামাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, বন্ধু, ভ্রাতা ইহাদিগকে যেরূপ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমের বলে মানুষ যে আপনাকে ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, পরের জন্য প্রাণদান পর্য্যন্ত করিতে পারে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখন এই প্রেমকে নিয়মিত করিয়া যদি ভগবৎ-চরণে সমর্পণ করা যায়, তাহাতে লোকে সংসারে থাকিয়াও সংসার ভুলিতে পারে। ভগবৎ-প্রেমের আসক্তি যতই বাড়ে, মাদকতা যতই প্রবল হয়, ততই সর্ব্বদা বিষয়দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও বিষয়বাসনার গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া যায়, এবং পরিশেষে মানুষ ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ও প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥

যাঁহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করেন, তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। ভক্তিসাধনের যে পরিণাম, জ্ঞানযোগেরও সেই একই পরিণাম। এস্থলে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। এই ভক্তিযোগ আমাদের অন্তরে নিহিত

অনুভব বৃত্তির (Feeling) অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিলাম, অনুভববৃত্তির অনুশীলন দ্বারা ভক্তি-যোগ সাধিত হয়। এখন দেখা যাউক, কর্ম্মযোগের সহিত ইচ্ছা শক্তির কি সম্বন্ধ।)

(আমাদের (Willing) বা ইচ্ছাশক্তির মূলে কোন একটী (Motive) বা কামনা থাকে। ইচ্ছাশক্তিরূপ বাষ্পযান (Engine) কামনা রূপ বাষ্প (Steam) এর দ্বারা পরিচালিত। কামনা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। যাহার যেরূপ কামনা, তাহার ইচ্ছা সেই কাম্যবস্তু লাভে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই কামনাই ইচ্ছাশক্তির মূলবস্তু। এই কামনাই মানুষের মনকে বিষয়বস্তুর প্রতি পরিচালিত করে। আমরা যাহা কিছু করি, সকলই এই কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া করি। আমরা যে রজ্জু দ্বারা এই সংসারের সহিত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, এই কামনাই তাহার মূল গ্রন্থি। এখন এই কামনা গ্রন্থি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে সংসারের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া যায়। বিষয়ের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হইলে, আমরা ক্রমে মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভ করিতে পারি। এই বিষয়গ্রন্থিচ্ছেদনের উপায়, কামনা-শূন্য হইয়া কার্য্য করা। সংসারে থাকিতে হইলে আমরা কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু সেই কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিলে, তদ্দ্বারা আমাদের সেই কর্ম্মজনিত ফলাফলের জন্য দায়ী হইতে হয় না, সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ পাপপুণ্য ভোগও করিতে হইবে না। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাকেই কর্ম্ম-

যোগ বলে। এই কর্ম্মযোগ ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মযোগ ইচ্ছাশক্তির (Willing) অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত।)

এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, অনুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অনুভবশক্তিই আলোচ্য বিষয়, তাহার অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, দেখা যাউক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, অনুভবশক্তির একটী প্রধান গুণ আসক্তি, অন্যটী মাদকতা। আসক্তি জন্মিবার কয়েকটী বিশেষ উপায় আছে। প্রথমতঃ যে বস্তুতে আমাদের আসক্তি জন্মিবে, তাহা আমাদের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া আবশ্যক। ইহার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সেই প্রকৃতির অনুকূল বস্তুকে সর্ব্বদা ধ্যান বা ধারাবাহিকক্রমে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা আবশ্যক। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়ের ধ্যান করে,তাহাতে তাহার আসক্তি জন্মিয়া যায়। বিষয় সম্বন্ধে যে কথা ঠিক্, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই কথা ঠিক্। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি জন্মিবার মূল কারণ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা ব্যক্তির অবলম্বন ভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে Feeling এর বিবরণে বিশেষরূপে দেওয়া হইয়াছে। (৪০ পৃষ্ঠা দেখ) কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি এইরূপে আসক্তি জন্মিলে, সেই আসক্তি মাদকতায় পরিণত

হয়। আসক্তির বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মন সম্পূর্ণরূপে মাতিয়া যায় ও অন্যান্য বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। মন যে প্রকার অনুভূতিতে অনুরক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তেজনা হইলে, অন্যান্য অনুভূতি তদ্দ্বারা পরাভূত হইয়া পড়ে ও অবশেষে সেই একই মাত্র অনুভূতি মনের উপর আধিপত্য করিতে থাকে।

(ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির মধ্যে প্রেমের বল অধিক। এই প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিয়া যদি তাহার অনুশীলন করা যায়, তবে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া যায়।) এখন এই ভগবৎ-প্রেমের অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। ইহাই ভক্তি-যোগ। এই ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান সাকার উপাসনা।

ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ।

অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, ভক্তির পরিস্ফুটনের জন্য কোন একটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সাকার, সগুণ অবলম্বনের আবশ্যক। সেই অবলম্বনই হিন্দুর ইষ্ট দেবতা বা Personal God!

অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, প্রেম জন্মিবার পূর্ব্বে প্রেমের বস্তু আমাদের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য শাস্ত্রের আদেশ, ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচন করিতে হইলে গুরু শিষ্যের প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, প্রেমের আসক্তি জন্মাইতে হইলে, সেই প্রেমের বস্তু ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ ধারাবাহিক ক্রমে চিন্তা করা আব-

শুক। ইহাই সাকার উপাসনায় ইষ্টদেবতার ধ্যান, ধারণা। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্॥"
>
> গীতা, ১২।৬-৭

অর্থাৎ যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই মদর্পিত-চিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভক্তির অনুশীলনের জন্য সদ্‌গুরু নির্ব্বাচিত সাকার ঈশ্বরমূর্ত্তিকে ধ্যান ও ধারণা দ্বারা পূজা করা আবশ্যক। পূজা অর্থে কেবল ভগবন্মূর্ত্তির পদতলে পুষ্প, বিল্বপত্র নিক্ষেপ, কিংবা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া নহে; ভগবান্‌কে আপনার করিয়া লইয়া, মন, প্রাণ এবং যাবতীয় কার্য্য তাঁহাতে অর্পণ করা। তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে হইলে, তাঁহার সহিত একটী লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, স্নেহ বা প্রেম, কোন না কোন একটী লৌকিক ভাব অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয়। যাহার সহিত কোন শোণিত-সম্বন্ধ নাই, তাহাকে ভালবাসিতে হইলে,ভাই,ভগ্নী,মাতা,পিতা, প্রভৃতি শোণিত-সম্বন্ধ জনিত ভাব তৎপ্রতি আমরা আরোপ করিয়া থাকি। তাহার কারণ, মাতা,

পিতা, ভাই, বন্ধু এই সকল শব্দ স্বভাবতঃ স্নেহমাখা, মধুর; এই সকল শব্দের সহিত স্নেহের মাধুর্য্য হৃদয়ে সিঞ্চিত হয়। তৎপরে ক্রমে এই সকল নামে ডাকিতে ডাকিতে (Association) অভ্যাস দ্বারা যাঁহার সহিত পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ ছিলনা, তাঁহার প্রতি মন স্নেহরসে আপ্লুত হয়। ঈশ্বর-প্রীতিও ঠিক এইরূপে হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে বলেন,—

"আদৌ সম্বন্ধস্থাপনম্"। ভক্তিসূত্র।

অর্থাৎ ভক্তিলাভের প্রথমে ভগবানের সহিত একটী সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে হইবে।

সম্বন্ধস্থাপন কাহাকে বলে? কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে অভ্যাস করা। একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, উপাসক এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, আবার তাহার পরমুহূর্ত্তেই মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, তাঁহার সম্বন্ধস্থাপন হয় নাই ও তাঁহার মাতা ও পিতা বলিয়া আহ্বান কেবল কথার কথা মাত্র, কদাচ হৃদয়স্পর্শী নহে। কারণ যে হৃদয় একবার পিতৃভক্তিতে আপ্লুত হইয়াছে, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পরমুহূর্ত্তেই কি প্রকারে মাতৃভক্তিতে অভিষিক্ত হইতে পারে? আমরা কি কখনও আমাদের লৌকিক মাতাকে পিতা কিংবা পিতাকে মাতা বলিয়া ডাকিতে পারি? সে যাহা হউক, ঈশ্বরের সহিত লৌকিক সম্বন্ধস্থাপন ভক্তিযোগের প্রথম সোপান। ভক্তিরস-ভেদে এই সম্বন্ধ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহবা ভগবান্‌কে মাতৃভাবে দেখেন, কেহবা পিতৃভাবে দেখেন, কেহ বা বন্ধুভাবে,

কেহ বা পুত্রভাবে, কেহ বা প্রভুভাবে, কেহ বা কান্তভাবে ভালবাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন সাধকগণের মধ্যে নন্দ ও যশোদা পুত্রভাবের উপাসক; অর্জ্জুন বন্ধুভাবের উপাসক; ব্রজগোপিকাগণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ কান্তভাবের উপাসক; হনুমান্ প্রভুভাবের উপাসক; রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ-পরমহংস প্রভৃতি মাতৃভাবের উপাসক ছিলেন।

এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের পর ঈশ্বরে চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি সমর্পণের অর্থ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি সকল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। চক্ষু দেখিবে কেবল তাঁহারই রূপ; কর্ণ শুনিবে কেবল তাঁহারাই গুণানুকীর্ত্তন; নাসিকা আঘ্রাণ করিবে কেবল তাঁহারই গাত্রগন্ধ; জিহ্বা আস্বাদন করিবে কেবল তাঁহার প্রসাদ; ত্বক্ অনুভব করিবে কেবল তাঁহারই সুস্নিগ্ধ করস্পর্শ। মন কেবল তাঁহারই গুণ স্মরণ করিবে; বুদ্ধি কেবল তাঁহারই গুণের বিচার করিবে। এমন কি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ সকলের ক্রিয়াও কেবল তাঁহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে। তাই মহর্ষি নারদ বলেন,—

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং
তস্মিন্নেব করণীয়ং, তস্মিন্নেব করণীয়ম্"। ভক্তি-সূত্র।

তাঁহাতে (ভগবানে) আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া, কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি তাঁহাতেই করিবে, তাঁহাতেই করিবে। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।

যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু খাইবে, যে কিছু হোম করিবে, যে কিছু দান করিবে, যে কিছু তপশ্চরণ করিবে, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযমাত্ম-ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত উপহার সকল গ্রহণ করি।

ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি যেরূপ ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য, বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিও সেইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি না হইলে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিতে পারে না। তাই ভক্তিযোগে ধ্যান, ধারণা দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ ভগবানের প্রতি কর্ম্ম সমর্পণ ও ভোগ্যবস্তু নিবেদন দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য যন্মহোষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥"

যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের দ্বারা সমাকৃষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত মহৌষধ বলিতেছি,—ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে, তৎসমস্তের দ্বারাই জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে—তবেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইবে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভক্তিযোগের সাধন-প্রণালীতে—(১) ঈশ্বরকে ধ্যান, ধারণা করা আবশ্যক; (২) চিত্তবৃত্তি তাঁহাতে অর্পণ করা আবশ্যক; (৩) ভোগ্যবস্তু তৎপ্রতি অর্পণ করা আবশ্যক। ঈশ্বরের মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সংসারের যাহা কিছু কার্য্য, সকলই তাঁহার উদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন করা, ও তৎপ্রতি যাবতীয় ভোগ্য বস্তু নিবেদন করা, ইহাই এক কথায় ভক্তিযোগের সাধন-প্রণালী। তিনি সগুণ, সাকার—তিনি মানসিক ক্রিয়ার বিষয়ীভূত,—তিনি মানুষের ন্যায় ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার মানবীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট, ভক্তের নিকট তিনি মাতা, পিতা, পুত্র কি সখা। ভক্ত তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহার স্তুতি করেন, তাঁহার রূপে মুগ্ধ না হইলে কখনও তাঁহাকে ভালবাসা চলে না। সেই অতুলরূপের মোহে পাগল হইয়া একদিন ভক্ত কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—

"তাই কালরূপ ভালবাসি;
কালী জগন্মোহিনী মা এলোকেশী।
মাকে সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥"

সেই রূপরাশিতে মজিয়া রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"কালরূপ অনেক আছে, এবড় আশ্চর্য্য কাল।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয় পদ্ম করে আলো॥

রূপে কালী, নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল।
ওরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, অন্যরূপ লাগেনা ভাল॥"

কাল শ্যামরূপের বিরহে অধীর হইয়া একদিন ব্রজগোপিকাগণ কাল যমুনাজলে ও কৃষ্ণমেঘে শ্যামরূপ দেখিয়া অধীর হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও সেই কালরূপে মজিয়াছিলেন। এই সকল সাধক কোন একটী বিশেষ মূর্ত্তি, বিশেষ রূপ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে তন্ময় হইয়াছিলেন। ভক্ত যে রূপে মন প্রাণ ঢালিয়া দেন, সেই রূপ ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের সর্ব্বরূপত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব তাঁহার চক্ষুতে কেবল সেই একই রূপের অন্তরালে চাপা পড়ে। যতই অনুরাগ বাড়িতে থাকে, যতই শিশুর ন্যায় প্রেম গাঢ় হয়, ততই ভক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা ভুলিয়া গিয়া সরল হইয়া মানুষের ভাব সম্পূর্নরূপে ঈশ্বরে আরোপ করেন। তিনি ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান, শোওয়ান, সাজান, তাঁহাকে ভয় দেখান, গালি দেন, কতই আবদার করেন। রামপ্রসাদ অভিমান ভরে বলিতেছেন,—

"মা ব'লে ডাকিস্‌নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দেখা দিত সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥"

আবার—

"মা মা ব'লে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব।
মা বলে আর কোলে যাবনা॥"

রামপ্রসাদ আবার ভৎর্সনা করিতেছেন,—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা;
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥"

ভক্ত আবার আবদার করিয়া বলিতেছেন,—

"এবার কালী তোমায় খাব।
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার)
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মাখেকো ছেলে;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! দুটোর একটা করে যাব॥"

"সখ্যরসে, গৌরবসম্ভ্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার সহিত গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া, কৌতুক; ভক্ত

কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণ করায় আপন সেবন।" *

"বৃন্দাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদর্শ। তাঁহাদিগের বিরহোন্মাদ এক গৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও ভিতরে দেখিতে পাই না। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, লুকোচুরি খেলা ভগবানের চিরাভ্যস্ত; গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনময় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, আবার সচেতন বোধে বৃক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, প্রেম-হাসি মাখা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া, নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন, তোমরা দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যাঁহার হাস্যদর্শনে মানি-

---

* "ভক্তিযোগ" শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত—২৭১ পৃষ্ঠা।

নীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন? হে কল্যাণি, গোবিন্দ-চরণাশ্রিত তুলসি! তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত যিনি অলিকুলমালিনী তোমাকে পাদপদ্মে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যুথিকে, করস্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চ্যূত, হে পিয়াল, হে পনস, হে কবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, কদম্ব, নীপ, হে যমুনাতীরবাসী তরুগণ, তোমরা ত পরের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আত্মহারা এই হতভাগিনীদিগকে ফেলিয়া কোন পথে গিয়াছেন, দেখাইয়া দাও।" ভাগবতের অনুবাদ। *

এস্থলে ব্রজগোপিকাগণ ভগবানকে যে ভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরহে আকুল হইতেছেন; কিন্তু ভগবান্ যে সর্ব্বত্রই আছেন, একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন একটি বিশেষ ভাবে, বিশেষ আকৃতিতে, ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে করিতে, ভক্ত শেষে দেখিতে পারেন, তাঁহার আরাধিত দেবতা জগন্ময়, বিশ্বরূপ। তখন আর পূজা অর্চ্চনার প্রয়োজন থাকে না। ভগবান্ অর্জ্জুন ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে মানবীয়ভাবে উপাসনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" ১১।৫৪

হে অর্জ্জুন! কেবল একমাত্র ভক্তিদ্বারা আমাকে এইরূপে (বিরাট্ রূপে) দেখিতে, তত্ত্বতঃ জানিতে ও আমাতে প্রবেশ

* "ভক্তিযোগ"—২৮০, ২৮১ পৃষ্ঠা।

করিতে পারা যায়। ভক্ত রামপ্রসাদ এইভাবে উপনীত হইয়াছিলেন,—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লেনা॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জাননা॥"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এইভাবে উপনীত হইয়াছিলেন,—

"তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। এক দিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষসকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন "প্রসাদি ফুলে কি ক'রে পূজা করিব।" তদবধি পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।" *

এইরূপে যে ভক্তিযোগের সাধনা কালীমূর্ত্তির ধ্যান ও ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সোপচার পূজায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অবশেষে সাধককে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া জগৎকে ব্রহ্মময় করিয়া দেখাইল। †

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ ভিন্ন ভক্তিযোগের সাধন হয় না। ইহার কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

---

* "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত," বাবু রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা।

† যাঁহারা বলেন, সান্তমূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা অনন্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাঁহাদের এমত সম্পূর্ণ ভুল।

ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু কি বলেন, প্রথমে দেখা যাউক। তিনি বলেন,—

"মানুষ যে আপনার দুর্ব্বলতা ও পরিমিত ভাব উপাস্যদেবতায় আরোপ করে, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেবতা আহার করেন, বস্ত্র পরিধান করেন, নিদ্রা যান, মল মূত্র পরিত্যাগ করেন, বিবাহ করেন, বংশরক্ষা করেন, স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া করেন, যুদ্ধ করেন, তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়া যান, সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, আবার তজ্জন্য অনুতাপ করেন, ক্রোধে অন্ধ হন, আবার স্তুতিবাক্যে জল হইয়া যান।"

"মানুষ অনেক পরিমাণে আপনার উপাস্য দেবতায় আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আরোপ করে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া কি পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময় বলিতে পারিব না? বিশুদ্ধ জ্ঞান, নির্দ্দোষ যুক্তি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সর্ব্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কোন প্রকার নাস্তিকতা এই মহান্ সত্যকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

"পরমেশ্বরকে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিলে কি তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয়? কে বলিল যে, জ্ঞানময়, প্রেমময় প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের গুণ দেওয়া হয়? দেবতাতে মানুষের গুণ আরোপ করা হয় না, মনুষ্যে দেবত্ব স্বীকার করা হয়। মানব-প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি দেবত্ব দেখিতে না পায়,—তাহার তুল্য অন্ধ আর কে আছে? পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময় বলিলে তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয় না, মানুষের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়।" *

---

* ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ—৭৭।৭৮ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্র বাবু আবার অন্যত্র ইহার বিপরীত বলিতেছেন,—

"তর্কচূড়ামণি বলেন, জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব। সুতরাং ঐ সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু মানবীয় ভাব কি পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমরা কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। মানবীয় বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্যভাবের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্য ভাব গ্রহণ করা মানবের পক্ষে অসাধ্য।" *

মানবীয় ও পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্যভাব যদি আমাদের মনের সীমার বাহিরে রহিল, যদি আমাদের কল্পনারও অতীত হইল, তবে পরমেশ্বর যে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময়, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? আমাদের কি মন ছাড়া অন্য কোন চিত্তবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় আছে, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের এই সকল গুণ বুঝিতে পারি? বস্তুতঃ নগেন্দ্র বাবু এস্থলে নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িতেছেন। নগেন্দ্র বাবু যে "বিশুদ্ধ জ্ঞান" "নির্দ্দোষ যুক্তি" দ্বারা ঈশ্বরের এই সকল অমানুষিক (?) গুণ প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা কি? দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, সেরূপ যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। নগেন্দ্র বাবু মনুষ্যে দেবত্ব আছে বলেন; কিন্তু মানুষের গুণ ভিন্ন অন্য গুণ যখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, তখন সেই দেবত্ব জানিবার উপায় কি? বর্ত্তমান যুগের গৌরব, পরমজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ইমারসন (Emerson) বলেন,—

* "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১৩০ পৃষ্ঠা।

"Man can paint, or make or think nothing but man." *Representative men.*

মানুষ, মানুষ ভিন্ন আর কিছু চিত্রিত করিতে পারে না, সৃজন করিতে পারে না, ও ভাবিতে পারে না।

একথা সম্পূর্ণ সত্য। মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসকেও ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্ম আঁরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! তুমি (স্বরূপতঃ) রূপবিবর্জ্জিত; কিন্তু আমার মন তোমার স্বরূপধ্যানে অশক্ত বলিয়া, আমি তোমার রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করিয়াছি। তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত; কিন্তু তোমাকে স্তুতি করিতে গিয়া সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি। তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছ; কিন্তু তীর্থযাত্রাদিদ্বারা আমি সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতাদোষ (আমার অক্ষমতা জনিত দোষ) ক্ষমা কর।*

ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে কিছু জ্ঞান, তাহা জগতের

* এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম নির্গুণ, অরূপ, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী, এ সকল জ্ঞান কি প্রকারে হইল? তাহার উত্তর, যুক্তি দ্বারা নহে, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস দ্বারা।

মধ্য দিয়া, জগতের সহিত মিলিত ভাবে, জগতের নাম ও রূপের সহিত মিশ্রিতভাবে না হইয়া পারে না। জগতের মধ্যে জড় আছে, আর চৈতন্য আছে। জগতের চৈতন্যাংশ মনুষ্যাদি প্রাণীতে প্রকাশিত হয়। সর্ব্বপ্রকার প্রাণী অপেক্ষা আবার মনুষ্যে চৈতন্যের অধিকতর বিকাশ দেখা যায়। মানুষ আপ্ত বাক্য দ্বারা বিশ্বাস করে—ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং তাহার নিজের মধ্যে যে চৈতন্য আছে, সেই চৈতন্যের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য বুঝিতে পারে। মানুষ নিজের চৈতন্য অবলম্বনে ঈশ্বর-চৈতন্য বুঝিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ মন ও মানসিক গুণের অবলম্বনে ভিন্ন হয় না। (১) মানুষ দেখে যে, যেখানে মানসিক গুণ সেখানেই চৈতন্য; সুতরাং

---

(১) তাই চণ্ডীতে ভগবতীকে স্তব করা হইয়াছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

মানুষ বিশ্বাস করে, যেখানে চৈতন্য থাকিবে, সেখানে মানসিক গুণও অবশ্য থাকিবে। মানসিক গুণ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য কিরূপ, তাহা মানুষের জ্ঞানের অতীত, মনের সীমার বাহিরে, মানুষ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। এইরূপে আবার মানসিক গুণ ছাড়া চৈতন্য কিরূপ, তাহা যেমন মানুষ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ শারীরিক বা ভৌতিক গুণ (material Attributes) ছাড়া চৈতন্য কিরূপ, তাহাও মানববুদ্ধির অগোচর। কারণ মন ছাড়া চৈতন্য যেমন মানুষের কল্পনাতেও আসে না, শারীরিক গুণ ছাড়া মনও আবার তাহার কল্পনাতে আসে না। (২) এইরূপে মানুষ যখন ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন ঈশ্বরের

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি সকল ভূতের মধ্যে চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, শ্রদ্ধারূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

(২) তাই চণ্ডীতে দেবগণ স্তব করিতেছেন,

"দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।"

যিনি দুর্গা, দুর্গম (বিপদ) হইতে পার করেন, যিনি সারস্বরূপা, যিনি সর্ব্বকারিণী, খ্যাতিরূপা, কৃষ্ণবর্ণা, ধূম্রবর্ণা, তাঁহাকে সতত নমস্কার।

"অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।''

যিনি অতি সৌম্যা অথচ অতি রুদ্রা বা কোপনস্বভাবা তাঁহাকে নমস্কার।"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

প্রতি তাহার নিজের দৈহিক ও মানসিক গুণ সকল আরোপ করে। তাহার নিজের গুণ আরোপ না করিয়া মানুষ কথনও ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না। তৎপরে যথন নিজের মন লইয়া ঈশ্বরের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, বিশেষতঃ ভক্তি-সাধানা আরম্ভ করে, তথন মন তাহার স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া রূপরসাদিতে অনুরক্ত হইতে চায়। রূপরসাদির প্রতিকৃতি ভিন্ন মনের গ্রহণীয় বিষয় কিছুই নাই, সে প্রথম হইতেই রূপরসাদির সহিত ব্যবহারে অভ্যস্ত, রূপরসাদি ছাড়া সে আর কিছুই চায় না। ব্রহ্মে রূপরসাদি নাই বলিলে, সে মানিবে না; রূপরসাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্ম তাহার সীমার বাহিরে; রূপরসাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্মে সে কথনও অনুরক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে অনুরক্ত হইতে গিয়া সে ব্রহ্মের প্রতি রূপরসাদি আরোপ করিয়া ফেলে। মন স্বভাবতঃ রূপরসাদিতে অনুরক্ত; কিন্তু আবার ব্রহ্মে সেই রূপরসাদি আরোপ করাতে, ক্রমে তাহার সেই রূপরসাদির অনুরক্তি ব্রহ্ম-অনুরক্তিতে পরিণত হয়। মানুষের বিষয়ানুরাগ স্বাভাবিক; ব্রহ্মে সেই বিষয়ের আরোপ করাতে সেই বিষয়ানুরাগ ক্রমে ব্রহ্মানুরাগে পরিণত হয়। মানুষের পক্ষে ব্রহ্মে মানবীয় ভাবের আরোপ করা স্বাভাবিক; আবার ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ যতই বৃদ্ধি হয়, ততই সেই মানবীয় ভাব আরও গাঢ়তর হইতে থাকে। কারণ,

---

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবতা সর্ব্বভূতের মধ্যে কান্তি ও লক্ষ্মী (শোভা) স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত স্থলে দৈহিক গুণে আরোপ করা হইয়াছে।

অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি সম্পূর্ণ মানবীয় ভাব; তাহা মানব হৃদয়ে মানবীয় কারণের সাহায্য ভিন্ন স্ফুরিত হইতে পারে না। ভক্ত কখনও ঈশ্বরের ঐশ্বরিক গুণ সকল সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভালবাসিতে পারে না। ভক্তের নিকট ঈশ্বরের ঐশীশক্তি চাপা পড়িয়া থাকে। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার নিকট সে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারে? ভক্তগণ যতই ভক্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, ততই ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সাধারণ মানুষের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণবিরহে অধীর হইতেন; কৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিত্ব তাঁহার নিকট চাপা পড়িয়াছিল। ভক্ত রামপ্রসাদ কালীকে গালি দিতেন, তাঁহাকে খাইতে চাহিয়াছিলেন; ভগবতীর ঐশ্বরিক ভাব তাঁহার নিকট চাপা পড়িয়াছিল। ইঁহারা ঈশ্বরে মানবীয় ভাবের আরোপ না করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব মনে রাখিলে, কখনও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, নিরাকারবাদী ঈশ্বরকে যে প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময় বলিয়া তৎপ্রতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, আর সাকার উপাসক ঈশ্বরে আহার, নিদ্রা-বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, এই উভয়ের মধ্যে কেবল মাত্রার (degree) প্রভেদ, রকমের (kind) প্রভেদ নহে। নিরাকারবাদী পূর্ব্বকথিত জড়বিদ্বেষ কিংবা জড়ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরকে কেবল কয়েকটী বিশেষ-গুণের সীমাবদ্ধ সহরদ্দের মধ্যে আটক করিয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া

ভালবাসিতে পারেন না, তাঁহারা ইন্দ্রিয়মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন না। নিরাকার উপাসক উপাসনা করিতে বসিয়া ভয়ে ভয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, পাছে কোন জড়মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার মনে উপস্থিত হয়; কিন্তু মনের ধর্ম্ম এই যে, চিন্তা করিতে হইলেই জড়বস্তুর চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইবে,—চিন্তার অর্থ জড়বস্তুর চিত্র সকল মনে সজ্জিত করা। সুতরাং নিরাকারবাদীর মন উপাসনার সময় এইরূপ জড়চিত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহাতে ভাবের উদয় হইতে পারে না। ভাবের উদয় হইলেও সেই ভাব কোনরূপ স্থায়ীমূর্ত্তি কিংবা অন্য অবলম্বনের অভাবে ঘনীভূত হইয়া জমাট বান্ধিতে পারে না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ কিংবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত ভক্তের উদ্ভব হওয়া একেবারেই অসম্ভব। একবার সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (Religion in solid and Liquid) এই নামে এলবার্ট হলে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, নিরাকারবাদীদিগের ঈশ্বরভক্তি সাধারণতঃ তরল ভাবাপন্ন (in a liquid state) তাঁহারা উপাসনার সময় কাঁদিয়া আকুল হইলেন, যাই উপাসনা মন্দির হইতে বাহির হইলেন, অমনি মনে তাহার কোনই চিহ্ন থাকিল না। ঈশ্বরভক্তির কঠিনতা (solidity) অভ্যাস করিবার জন্য তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিরাকারবাদী উক্ত সীমানা-সহরদ্দ না ভাঙ্গিয়া দিলে কখনও সেই কঠিন, গাঢ়, জমাটবান্ধা ভক্তিরসের আস্বাদ পাইবেন না। কি গুরুতর ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরাকার-বাদিগণ প্রচলিত সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া-

ছেন! চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি, জ্ঞানমার্গ বলিয়া গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত উপাসনা নিতান্ত নিষ্ফল (failure); এখন দেখিলাম, ভক্তিযোগের হিসাবেও তাহা অকিঞ্চিৎকর।

প্রচলিত সাকার উপাসনা।

প্রচলিত সাকার উপাসনা ভক্তিযোগের সাধনা। কেবল ভক্তিযোগের নহে, জ্ঞানযোগেরও সাধনা। জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে হইলে, প্রথমে সগুণ, সাকার উপাসনা অভ্যাস করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা আবশ্যক। ইহা জ্ঞানযোগের অধিকারিতত্ত্বে বিস্তৃতরূপে বুঝান হইয়াছে। সেই জন্য প্রচলিত সাকার উপাসনা যেমন ভক্তিযোগের সাধনা, তেমন জ্ঞানযোগেরও সাধনা। সাকার উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে, তখন সাধক বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, ও নির্জ্জন গিরিগুহা, বিজন অরণ্য,পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সাধনোপযোগী স্থান আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। উপাস্য দেবতার ভেদ অনুসারে আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যথা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য। উপাস্য দেবতার ভেদ হওয়ার কারণ বহু দেবতার স্বীকার নহে; একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাব অবলম্বনে উপাসনা। ইহা ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভক্তিরসের পার্থক্য অনুসারে ইহার কোন কোন সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী

আবার পাঁচভাগে বিভক্ত; যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এই সর্ব্বপ্রকারের উপাসকগণ গুরুর নিকট নিজ নিজ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাকার উপাসনা দ্বারা ভক্তির সাধন করিয়া থাকেন। *

সাকার উপাসনা প্রণালী প্রধানতঃ দুই প্রকার, নিত্য ও কাম্য। নিত্য উপাসনা, যেমন সন্ধ্যা ও পূজা যাহা প্রত্যেক উপাসক প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য; যাহা না করিলে পাপ-গ্রস্ত হইতে হয়। কাম্য উপাসনার সেরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নাই, তাহা compulsory নহে, optional ইচ্ছাধীন—তাহা ভগবানের কোনও বিশেষ বিশেষ আবির্ভাব উপলক্ষ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কাম্য উপাসনা উৎসবময়, যেমন খ্রীষ্টানদিগের Christmas বড় দিন, মুসলমানদিগের মহরম, ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে এই সকল উৎসবময় কাম্য উপাসনা অনুষ্ঠানের দ্বারা নিত্য উপাসনা অধিকতর রুচিকর হয়। কাম্য উপাসনার পদ্ধতি এস্থলে বিবৃত করা অসম্ভব। নিত্য উপাসনার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা কাম্য উপাসনারও অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইবে। নিত্য উপাসনাপদ্ধতি কিরূপ, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তিযোগের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা একবার দেখা যাউক।

---

* বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে এই সকল সাধন প্রণালী অনুষ্ঠিত হইতেছে, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু এস্থলে সে বিষয় বিচার্য্য নহে। যাঁহারা শাস্ত্র ও গুরূপদেশানুসারে সাধন করিতে পারেন না, সে কেবল তাঁহাদের দোষ, শাস্ত্র ও তৎপ্রচারিত উপাসনা-প্রণালীর দোষ নহে।

নিত্য উপাসনা—সন্ধ্যা ও পূজাপদ্ধতি এস্থলে বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে বিষয় অন্য পুস্তকে পড়িয়া লইবেন, কিংবা সে সম্বন্ধে উপযুক্ত লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল মোটামুটী কয়েকটী কথা এখানে বলা যাইতেছে। নিত্য উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়—

(১) চিত্তশুদ্ধির জন্য আচমন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

(২) ইষ্টদেবতার ধ্যান ও মানসপূজা।

(৩) ইষ্টদেবতার বাহ্যপূজা।

(৪) ইষ্টদেবতাকে বিশ্বরূপ জানিয়া জগতের সহিত তাঁহার পূজা।

(৫) নামজপ, স্তব, প্রণাম, আত্ম-নিবেদন ইত্যাদি।

ইষ্টদেবতাকে হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান করিয়া মানস উপহার দ্বারা তাঁহার মানসপূজা করিতে হয়। তৎপরে কোন বাহ্য বস্তু অবলম্বনে তাঁহার বাহ্যপূজা করিতে হয়। বাহ্য অবলম্বন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই দুই শ্রেণীর। স্বাভাবিক অবলম্বন যথা—বৃক্ষ (তুলসী, বিল্বাদি), পুষ্প (জবা, পদ্মাদি), জল ইত্যাদি। কৃত্রিম অবলম্বন যথা শালগ্রাম, শিবলিঙ্গাদি। বাহ্য পূজাতে দেবতাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, বস্ত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু নিবেদন করিতে হয়। এই প্রকারে ইষ্টদেবতার পূজা ভিন্ন, সূর্য্যাদি গ্রহ, ইন্দ্রাদি দেবতা, আকাশাদিভূত, মৎস্যাদি অবতার এইরূপ বিশ্বরূপ ঈশ্বর যে সময়ে যে ভাবে যে আকারে আবির্ভূত হইয়াছেন বা হইতেছেন, সে সকলেরও পূজা করিতে হয়।

যেমন শিবপূজা করিতে বসিয়া উপাসককে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। শক্তিপূজা করিতে বসিয়া উপাসককে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাব ও অনেক দেবতার পূজা করিতে হয়। হিন্দুর ইষ্টদেবতা বিশ্বমূর্ত্তি, বিরাট্ পুরুষ; তাঁহার পূজাতে বিশ্বজগতেরও পূজা করিতে হয়। বিশ্বজগতের পূজা না করিলে প্রকৃতরূপে তাঁহার পূজা করা হয় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য রূপরসাদির মধ্যে থাকিয়া, রূপরসাদির সাহায্যে ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার দ্বারা মোক্ষলাভ। সেই অনুরাগ সঞ্চার দুই প্রকারে হয়—ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা ও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির দ্বারা। বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় ঈশ্বরে ভোগ্য বস্তু নিবেদন করা। উল্লিখিত সাকার উপাসনা পদ্ধতি দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ধ্যান অর্থে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপের ও ভাবের ধারাবাহিক ক্রমে চিন্তা। ইষ্টদেবতা মূর্ত্তিতে সেই রূপ ও ভাব প্রকটিত। ঈশ্বরের ধ্যান যে কেবল সন্ধ্যা ও পূজার সময়ে করিতে হয়, এরূপ নহে। ঈশ্বরানুরাগ লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হৃৎপদ্মে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেবল সন্ধ্যা ও পূজা করা তাঁহার উপাসনা নহে। সংসারের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ও সে সকলও তাঁহার উপাসনার মধ্যে গণ্য হইবে। ইষ্ট দেবতার পূজা শেষ করিয়া তাঁহাকে এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিতে হয়,—

"প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তবপূজনম্॥"

"হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা যাহা করি, সকলই তোমার পূজা হউক।"

উল্লিখিত সন্ধ্যা পূজা বিধিমত অভ্যাস করিলে তদ্দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ও ক্রমে ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হয়। চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের পবিত্রতা লাভ করিবার উপায় হিন্দুর সন্ধ্যাপূজার ন্যায় বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দু উপাসক পবিত্র স্থানে, পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পবিত্র আসনে, পবিত্র ভাবে, পবিত্র পুষ্প চন্দনাদি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে বসেন। ধূপের পবিত্র গন্ধে তাঁহার চিত্তে পবিত্র সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। ইহার পর পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যখন পরমদেবতার পরম পবিত্র চরণপদ্ম হৃদয়পদ্মে ধারণা করেন, তখন তাঁহার চিত্ত অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য এক মহান্ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে। সংসারের মলিনতা তখন সেই পবিত্র চরণস্পর্শে বিদূরিত হয়। ঈশ্বরের পবিত্রমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে বসিলে সাধ্য কি পাপের চিত্র সেখানে প্রবেশ করিতে পারে? বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"যথাগ্নিরুদ্ধত-শিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্॥
ষষ্ঠ অংশ, ৭ম অধ্যায়, ৭৩।

যেমন বাতাসের সাহায্যে অগ্নি উচ্চশিখা ধারণ করিয়া

অনায়াসেই শুষ্ক তৃণ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ বিষ্ণুর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে তদ্দ্বারা যোগিগণের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।

এইরূপে ভগবানকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে লৌকিক আচার অনুসারে আবাহন, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে সগন্ধ পবিত্রপুষ্প, পবিত্র জল, পবিত্র বিল্ব ও তুলসী পত্র সমর্পণ করিতে করিতে উপাসকের মন সেই পবিত্র ভাবে অভ্যস্ত হয়। পরে নৈবেদ্য অর্থাৎ উপাসক যাহা কিছু নিজে খাইতে ভালবাসেন, তাহাই পবিত্রভাবে ভগবান্‌কে অর্পণ করিলে সেই ভোগ্যবস্তু পবিত্র হইয়া যায়। তাহা যখন ভক্ত ভগবানের প্রসাদ বলিয়া নিজে গ্রহণ করেন, তখন সেই ভোগ্যবস্তু আস্বাদন দ্বারা তাহার প্রতি আসক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভোগ্যবস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি নহে, উপাসকের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি-পূর্ব্বক চিত্তের পবিত্রতা লাভ। এইরূপে পূজা করিয়া উপাসক ভগবানের পবিত্র মন্ত্র জপ করেন। জপ অর্থে পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম বা মন্ত্র উচ্চারণ। যেমন ভগবানের রূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা ধ্যান করিলে তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে, সেইরূপ তাঁহার নাম জপ করিলেও নামের প্রতি চিত্ত আসক্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নামও নাই, রূপও নাই। কিন্তু সাধকের হিতের জন্য তিনি রূপ ও নাম স্বীকার করিয়াছেন। এক জ্ঞানযোগী ভিন্ন কেহ কখনও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না। কিন্তু রূপ ও নাম (colour and sound) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, তাহা সকলেরই আয়ত্ত; সকলেই ইচ্ছা করিলে রূপ ও নামের অবলম্বনে তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারে।

তাই পরমকারুণিক ভগবান্ নিজে অরূপ ও অনামা হইয়াও কেবল ভক্তের উপকারের জন্য, সাধকের হিতের জন্য রূপ ও নাম স্বীকার করিয়াছেন। সাকার উপাসক সেই রূপ ও নামের ধ্যান করিয়া তদবলম্বনে তাঁহাতে আসক্ত হইতে পারেন। সাকার উপাসনায় রূপ ও নাম এই উভয়েরই সাহায্য লওয়া হয়। কিন্তু নিরাকারবাদীর নাম অবলম্বনে উপাসনা করিতে কোন আপত্তি নাই, কেবল রূপের বেলায় আপত্তি। এই নামরূপময় জগতে রূপ ছাড়া নাম নাই ও নাম ছাড়া রূপ নাই। নাম চিন্তা করিতে গেলে তাহার সঙ্গে রূপ অবশ্যই আসিবে। ভগবান্ রূপ ও নামের প্রসাদ হাতে করিয়া আমা-দিগকে ডাকিতেছেন "হে মানবগণ! কেবল তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমি নিজে রূপ ও নাম গ্রহণ করিয়াছি, এই রূপ ও নামের হরির লুট তোমরা গ্রহণ কর, রূপ ও নাম লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাধন করিলে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে দেখা দিব।" ভগবানের রূপ ও নাম বড়ই অমূল্য বস্তু। তাই নিরাকারবাদী! মিথ্যা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া আর কতকাল সেই অমূল্য রূপরত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

এই প্রকার উপাসক প্রত্যহ তিনবার সন্ধ্যা ও পূজা করেন। দিনের মধ্যে তিনবার তাঁহার চিত্ত এইরূপ পবিত্র রসে আপ্লুত হয়। এই তিনবার এই প্রকার পবিত্রতার তরঙ্গে অবগাহন করাতে মন দিনের অন্যান্য সময়েও পবিত্র-ভাব ছাড়িতে পারে না। দিনের মধ্যে তিনবার ভগবানের রূপ ও নাম ধ্যান করিলে, অন্যান্য সময়েও সেই রূপ ও নাম হৃদয়ে জাগরূক থাকে। বিষয়কার্য্য করিবার সময়েও সেই রূপ ও

নামের মহিমা স্মরণ থাকাতে পবিত্রভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। এইরূপে সাকার উপাসক সংসারের যাবতীয় কার্য্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করিতে পারেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাও তাঁহার পূজার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভ্যাস দ্বারা পরিশেষে নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার জন্মে। এখানে ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগে পরিণত হয়। *

এই ভক্তিযোগের প্রধান উপকরণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ভক্তি। সন্ধ্যা-পূজাদি সেই ভক্তি জন্মিবার সহায়তা করে। কিন্তু সন্ধ্যা-পূজাদি অনুষ্ঠান করিতে হইলেও আবার চিত্তে স্বভাবজাত একটু ভক্তি থাকা আবশ্যক। সন্ধ্যা-পূজাদি দ্বারা সেই সহজাত ভক্তি ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। লৌকিক ভাবে দেখিতে গেলে একজন লোকের উপর আর এক জনের স্বভাবতঃ একটু পক্ষপাতিত্ব থাকে। তৎপরে আলাপ, ব্যবহার দ্বারা ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই সেই পক্ষপাতিতা অনুরাগে, বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক সন্ধ্যা-পূজাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও এইরূপে ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি জন্মে।

ভক্তিযোগের সাধকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই শ্রেণীবিভাগ উপাসকের প্রকৃতি ও কামনা লইয়া। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই,

---

* ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভক্তিযোগের পরিণাম জ্ঞানযোগ। সেই জ্ঞানযোগের অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের পরিণতি হইলে কোন ভেদ থাকে না।

যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, যে যেরূপ সংসর্গে জীবন কাটাইয়াছে, তাহার উপাসনাও সেই প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তি বা ঈশ্বরানুরাগ হৃদয়ের বস্তু। তাহা বাহিরে কার্য্য দ্বারা প্রকাশ হয় মাত্র। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিতে অভ্যস্ত, সে সেই ভাবেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সেই ভাবেই ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। পূজনীয় বা মাননীয় ব্যক্তিকে অভিবাদন, এক এক জাতীয় লোক এক এক ভাবে করিতেছেন। হিন্দুগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করেন। মুসলমানগণ ভূমিতে করস্পর্শপূর্ব্বক সেলাম্ দ্বারা করেন। আবার পাশ্চাত্য জাতি করমর্দ্দন দ্বারা, কিংবা হস্ত দ্বারা মস্তক ঈষৎ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করেন। কিন্তু বাহিরের ক্রিয়া ভিন্ন হইলেও সকলেরই অভিবাদন করিবার সময়ে অন্তঃকরণের ভাব একই রূপ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করা সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। সাত্বিক প্রকৃতির লোক একরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এক ভাবে ভগবানের সেবা করেন, রাজসিক প্রকৃতির লোক অন্যরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যরূপ সেবা করেন,আবার তামসিক প্রকৃতির লোক আর এক প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আর এক প্রকারে তাঁহার সেবা করেন এই সকল স্ব স্ব বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য ভিন্ন হইলেও তদ্দারা একমাত্র হৃদয়ের ভক্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবার কতকগুলি অনুষ্ঠান, কি সাত্বিক কি রাজসিক, কি তামসিক সকল প্রকার লোকেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। উপরে যে সাকার উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে,

তাহা সকল প্রকার উপাসকেরই অনুষ্ঠেয়। এতদ্ভিন্ন অনেক অনেক স্থলে লোকাচার বা দেশাচার অনুসারে ভগবৎসেবার ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। আর আমাদের সমাজে আজ কাল যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা অনেক স্থলে শাস্ত্রের বিধান অতিক্রম করিয়া অজ্ঞলোকের মূর্খতা ও কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সে সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। আধুনিক শাস্ত্র-শিক্ষা দ্বারা তাহা ক্রমে দূরীভূত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

নগেন্দ্র বাবুর আপত্তি-খণ্ডন।

এখন প্রচলিত সাকার উপাসনা সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিচার করা যাউক। নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"সাকার পূজা সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্রচলিত প্রতিমাপূজা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে প্রতিমাতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। একথা একভাবে সত্য। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী সকলেরই লক্ষ্য সেই পরাৎপর পরম পুরুষ। কিন্তু যে ভাবে, যেরূপ বিশ্বাসে প্রতিমা পূজা, দেব দেবীর পূজা এদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উহাকে সত্যস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা বলিতে পারি না। প্রচলিত সাকার উপাসনা, দেবদেবী মূর্ত্তি পূজা কখনই পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে না।" *

---

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২৯ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্র বাবু এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

(ক) "কাশীর বিশ্বেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড। উহাতে ঈশ্বরের সত্তা আছে সত্য, কিন্তু উহা সেভাবে পূজনীয় নহে। তাহা যদি হইত, তবে রাস্তার একখণ্ড প্রস্তরও পূজিত হইত। অন্য কোনরূপ বিশ্বাস উহার মূলে আছে।"

(খ) "সাকারবাদিগণ যে দেবমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আহার করে, নিদ্রা যায়, শয্যায় শয়ন করে, এমন কি মশক দংশনের কষ্ট নিবারণের জন্য উহার মশারি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। * * * * ইহাই কি পূর্ণ পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা?"

(গ) "প্রচলিত সাকারবাদ যে পরিমিত কল্পিত দেবদেবীর পূজা; সত্য-স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বাঙ্গালী জাতির সর্ব্ব প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবের বিষয় আলোচনা কর। দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে "সর্ব্বসাধারণের" বিশ্বাস এই—মা ভগবতী সম্বৎসরকাল পতিপুত্র লইয়া কৈলাসে বাস করেন; বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য বাঙ্গালী ভক্তের গৃহে আসিয়া থাকেন। সে জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণাদি পূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে আহ্বান করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে আবার তিনি এক বৎসরের জন্য চলিয়া যান। তখন বিসর্জ্জন করিতে হয়। ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা?"

(ঘ) "এ দেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা কেবল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা নহে। আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক পদার্থ সকলেরও পূজাও তাহার অন্তর্গত। চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী সকলই এই পূজার অন্তর্গত।"

এদেশে প্রচলিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা যে এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে "সর্ব্বসাধারণের" বিশ্বাস যাহাই থাকুক,

শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ প্রণালীর আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সাধারণ লোক অশিক্ষিত, মূর্খ, শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই জানে না। শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া অনেক সময় মনঃকল্পিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাদের দোষে শাস্ত্রোক্ত সাকারউপাসনা প্রণালীর দোষ দেওয়া অবৈধ। ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছি, অজ্ঞান ও কুসংস্কারের জন্য যে সকল আবর্জ্জনা সমাজের মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা হিন্দু সমাজের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার উপায় সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রশিক্ষার বিস্তার। কিন্তু সাধারণের দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে এইরূপ কুসংস্কার আছে বলিয়া, দেবদেবীর পূজা দেশ হইতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিরাকারবাদ সংস্থাপন করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মূলে সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, এ কথা নিশ্চিত যে, তাহা কখনও সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। বালকদিগের মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে কি প্রকারে নিরাকারবাদের প্রচার হইতেছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত লোকের মন সুশিক্ষা দ্বারা দেবদেবী পূজার উচ্চভাব গ্রহণ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহারা তাহাদের চিত্তের অনুকূল, সহজ বোধগম্য ভাব সকল কল্পনা করিয়া লইবে। কিন্তু একেবারে ভাব শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সে সকল মনঃকল্পিত ভাবে উপাসনা দ্বারাও সুফল ফলিতে পারে। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত হার্ব্বাট্ স্পেন্সার বলেন,—

"During each stage of Evolution men must think in such terms of thought as they possess. While all conspicuous changes of which they can observe the origins, have men and animals as antecedents, they are unable to think of antecedents in general under any other shape, and hence creative agencies are of necessity conceived by them in these shapes. If during this phase these concrete conceptions were taken from them, and the attempt made to give them comparatively abstract conceptions, the result would be to leave their minds with none at all ; since the substituted ones could not be mentally represented. Similarly with every successive stage of religious belief down to the last * * * And at the present time, the refusal to abandon a relatively concrete notion for a relatively abstract one, implies the inability to frame the relatively abstract one ; and so proves that the change would be premature and injurious. Still more clearly shall we see the injuriousness of any such premature change, on observing that the effects of a belief upon conduct must be diminished in proportion as the vividness with which it is realized becomes less * * * During every phase of civilization, the actions of the unseen Reality as well as the resulting rewards and punishments, being conceivable only in such forms as experience furnishes, to supply them by higher ones before wider experiences have made higher ones conceivable, is to set up vague and uninfluential motives for definite and influential ones. Even now, for the great mass of men, unable through lack of culture to trace out with due clearness those good and bad consequences which conduct brings round through the established order of the unknowable, it is needful that there should be vividly depicted pictures of future torments and future joys—pains and pleasures of a definite kind produced in a manner direct and simple enough to be clearly imagined. Nay, still more must be conceded. Few, if any, are yet fitted wholly to dispense

with such conceptions as are current. The highest abstractions take so great a mental power to realize with any vividness, and are so inoperative upon conduct, unless they are vividly realized that their regulative effects must for a long period to come be appreciated on but a small minority."

First Principles vol. I. pp. 116—117.

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই। মানব সমাজের ক্রমোন্নতির প্রত্যেক বিকাশাবস্থায় মানবগণ তাহাদের নিজ নিজ অভ্যস্ত ভাবে সকল বিষয় চিন্তা করে। সেই জন্য তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে সাধারণ মানুষের ভাবে বিশেষ বিশেষ (concrete) গুণ দ্বারা ভাবিয়া থাকে। যদি এই সকল বিশেষ বিশেষ মানবীয় ভাবে ঈশ্বর চিন্তা তাহাদিগের মন হইতে বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম (abstract) ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা সে সকল সূক্ষ্মভাবের ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের মনে কোন ভাবই জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভাব ক্রমোন্নতির প্রত্যেক অবস্থাতেই ঘটে। আধুনিক সময়ে এই সকল বিশেষ ভাবের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম সাধারণ ভাব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা বিফল দেখা যায়। তাহাতে বুঝা যায় এই—এইরূপ পরিবর্ত্তন অসাময়িক ও ক্ষতিকর। যখন এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর লোকের চরিত্র নির্ভর করে, তখন যে পরিমাণে সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত ভাবের হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণে লোকের চরিত্রও মন্দ হইবে। সভ্যতার প্রত্যেক অবস্থাতে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি লোকে তাহাদের নিজ নিজ জ্ঞানের সীমা অনুসারে ধারণা করিতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে এই সম্বন্ধে যে সকল

জলন্ত ভাব ও চিত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা তাহাদের চরিত্রের উপর বিশেষরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। এ সকলের পরিবর্ত্তে অস্পষ্ট ও অস্ফুট ভাব সকল প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না, ও তদ্দ্বারা তাহাদের চরিত্রের উপর কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস হইবে। প্রচলিত ভাব সকল ছাড়িয়া দিয়া উচ্চতর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ লোক থাকিলেও নিতান্ত বিরল। উচ্চতম সূক্ষ্মভাব সকল পরিষ্কাররূপে ধারণা করিতে হইলে অতি উচ্চ মানসিক শক্তির প্রয়োজন; সে সকল স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে না পারিলে আবার চরিত্রের উপর তাহাদের কার্য্যকারিতা থাকে না। সুতরাং অতি অল্প লোকেই সে সকল ধারণা করিয়া চরিত্রোন্নতি লাভ করিতে পারে। *

অতএব প্রচলিত সাকার উপাসনার মধ্যে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমূলক ভাব সকল প্রবেশ করিয়া থাকিলেও তাহা দূর হওয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলই যে কুসংস্কার ও অজ্ঞতামূলক বিশ্বাস তাহা বলা যাইতে পারে না। তাহা নিম্নে দেখা যাইতেছে।

(ক) কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি প্রস্তর খণ্ড। আবার রাস্তার প্রস্তর খণ্ডও প্রস্তর খণ্ড। বিশ্বেশ্বর—প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় রাস্তার প্রস্তরখণ্ডেও শিবের পূজা হইতে পারে। রাস্তার প্রস্তর খণ্ডে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শিবের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিলে তাহাতেও শিবের পূজা হইতে পারে। এরূপ পূজা সর্ব্বত্র

* ব্রাহ্মসমাজে যে সকল নীতি হীনতার কথা শুনা যাইতেছে, তাহার কারণ ইহা কিনা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিবেচ্য।

হইতেছে। উড়িষ্যার অনেক গ্রামে বট গাছের তলে অনেক সিন্দুর-লিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। তাহারাও এক সময়ে রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে পড়িয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সকল প্রস্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হইল, সেই সময় হইতে সে সকলের অবলম্বনে ভগবানের পূজা হইতে লাগিল। ভগবানের সত্তা সর্ব্বত্র সমভাবে উপলব্ধি করা বড়ই কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ।

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥" গীতা ১৩।২৮

"যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতরূপে যথোক্তলক্ষণসম্পন্ন আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিই জরা, মৃত্যু, সুখ, শোক ও কর্তৃত্ব, হর্তৃত্বাদি প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি আত্মাতে আরোপিত করিয়া 'আমি আহত হইলাম, আমি হত হইলাম, ইত্যাদি রূপ মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আত্মঘাতক হন না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্বদর্শী মহাত্মা পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন।"

সর্ব্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দর্শনের অর্থ কেবল মনের বিশ্বাস নহে, প্রত্যক্ষ অনুভূতি (Realization) সেই সর্ব্বত্র সমদর্শন কেবল মুখের উপদেশে, কিংবা বক্তৃতার বাগাড়ম্বর দ্বারা শিক্ষা হয় না। তাহা বহুজীবনব্যাপী অনুশীলনের ফলে ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বত্রসমভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিতে হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহাকে দর্শন করা অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সর্ব্বত্র সমদর্শন হইতে পারে। তাই বিশেষ বিশেষ স্থলে কৃত্রিম কিংবা স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সর্ব্বত্রসমদর্শী মহাপুরুষ

কাশীর শিবলিঙ্গের মধ্যেও যে প্রকারে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন করেন, অন্যান্য প্রস্তরখণ্ডেও সেইরূপ দর্শন করেন। কিন্তু তুমি আমি সেইরূপ পারি না বলিয়া আমাদের সর্ব্বত্র সমদর্শন শিক্ষার জন্য, বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তিতে ও অন্যান্য মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও একটী কথা। বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর মূর্ত্তি কিংবা জগন্নাথের কাষ্ঠময়মূর্ত্তি এ সকলের কি প্রকৃত কোনই মাহাত্ম্য, কোনই বিশেষত্ব নাই? যদি না থাকিবে, তবে এক বৎসর নয়, দশ বৎসর নয়, সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত— একজন নয়, শত জন নয়, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ—কোন্ আকর্ষণ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে, সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এমন কি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সেই কাষ্ঠ ও পাষাণের নিকট ছুটিয়া আসিয়া মস্তক অবনত করিতেছে? যদি বল কুসংস্কার, তবে বল দেখি ভাই, যাহা মিথ্যা, যাহা অসত্য, তাহা কতদিন টিকিতে পারে? তুমি আমি কুসংস্কারের দাস হইতে পারি, কিন্তু জ্ঞানির শিরোমণি যাঁহারা, যাঁহাদের জ্ঞানালোকে আজ পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত হইতেছে, সেই সকল ঋষিগণ কেন তাহাতে ভুলিয়াছিলেন? বেশী দিনের কথা নয়, জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী কেন অন্য স্থান ভুলিয়া সেই কাশীর প্রস্তরখণ্ডের আশ্রয় লইয়াছিলেন? তুমি আমি জগন্নাথের মূর্ত্তিকে (hideous idol) বীভৎসমূর্ত্তি বলিয়া উপহাস করিতে পারি, কিন্তু এই দেখ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কি ভাব হইয়াছিল,—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার;
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় সমকাল।

মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ;
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ;
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম,
জজ, গগ, জজ, গগ, গদগদ বচন ॥" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই ভাবের রসে "সাতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগদ্বন্ধুকে দেখিয়া গাহিয়াছিলেন,—

সেই পরাণনাথে পাইনু।
যাঁর লাগি মদনে ঝরিনু ॥" *

আমাদের সামান্যবুদ্ধিতে এই সকল মহাভাব বোধগম্য হইতে পারে না। আমরা এই সকল দেবমূর্ত্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না।

(থ) ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে নিরাকারবাদী ঈশ্বরকে যে প্রেমময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানময় বলিয়া তৎপ্রতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, আর সাকার উপাসক ঈশ্বরে আহার, নিদ্রা, শয়নাদি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, এই উভয়ে কেবল মাত্রার প্রভেদ, রকমের প্রভেদ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখিয়াছি, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যতই গাঢ় হয়, ততই তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব ভুলিয়া গিয়া সাধক তাঁহাকে আপনার আপনি করিয়া ফেলেন। ইহার দৃষ্টান্তও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সাকার উপাসককে ঈশ্বরের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া, নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ইহাই কি পূর্ণ, পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা?" মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন কৃষ্ণবিরহে

---

* ভক্তিযোগ—২৭৮ পৃষ্ঠা।

অধীর হইয়া মহাভাব প্রাপ্ত হইতেন, তখনও নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বলিতে পারিতেন—"ঈশ্বরত সর্ব্বত্রই আছেন, এই কি আপনার পূর্ণ, পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা ?" বলা বাহুল্য, ভক্ত যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হন, ঈশ্বরকে আপনার আপনি করিয়া ফেলেন, তখন বাস্তবিকই তিনি ভগবান্‌কে মশকে দংশন করিবে এরূপ আশঙ্কা করেন, ভগবানের ক্ষুধায় কষ্ট হইবে বলিয়া আকুল হন, ভগবান্‌কে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া মন প্রাণ চরিতার্থ করেন। আমার একজন সাধুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি শীতকালের রাত্রি লম্বা বলিয়া প্রত্যহ সকালে শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন করিয়া তাঁহার গোপালকে ভোগ দিতেন। এই সকল ভাব উপলব্ধি করা তোমার আমার অসাধ্য। তবে একথা বলিতে পারি না, যেখানে যেখানে দেবমূর্ত্তির এইরূপ সেবা করা হয়, সেখানেই সেই মহাভাব আছে। ভক্ত সাধকগণ যেভাবে উপাসনা করেন, অপর সাধারণও সেই প্রণালীর অনুবর্ত্তী হয়। ইহা ছাড়া আরও একটী কথা আছে। ভগবানে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু নিবেদন দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হয়। এবিষয় পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ভক্তি-যোগ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহারাও ভগবান্‌কে ভোগ্যবস্তু সকল নিবেদন করেন।

(গ) অজ্ঞানী "সর্ব্বসাধারণের" দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রকার বিশ্বাসই থাকুক, যাঁহাদের শাস্ত্রের সহিত একটুমাত্র পরিচয় হইয়াছে, যাঁহারা "চণ্ডীপাঠ" একবার মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহা-রাই দুর্গাপূজা যে সগুণ পরব্রহ্মের পূজা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানেন। মহামূল্য চণ্ডীগ্রন্থে দুর্গাপূজার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে লোকে দুর্গাপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়, সেই জন্য দুর্গোৎসবের সময় চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুর্গোৎসবে যে মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে, তাহা চণ্ডীতেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি যে পরব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, তাহা সেই চণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥" চণ্ডী।

অর্থাৎ সেই জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা এবং উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যা। তিনি সমুদায় বিশ্বই ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকার উৎপত্তি আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মহামায়া নিত্যা বলিয়া অভিহিতা হইলেও, দেবতাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, তখন লোক মধ্যে (লৌকিক ভাষায়) তিনি উৎপন্না বলিয়া কথিতা হন। বাস্তবিক তাঁহার উৎপত্তি বিলয় নাই।

এইরূপে পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি যে মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর নাশ করিয়াছিলেন, দুর্গোৎসবে তাঁহার সেই মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবগণ তাঁহার সেই মূর্ত্তির স্তব করিয়াছেন,

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভি রপ্যপরা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা॥"

তুমিই বিকার-রহিতা, আদ্যা, পরমা প্রকৃতিরূপে প্রকা-

পিতা। তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা। তুমি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও রাগদ্বেষাদিযুক্ত বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি তোমার প্রকৃততত্ত্ব অবগত নহেন। তুমি সকলপদার্থের আশ্রয়ভূতা, অর্থাৎ সর্প যেমন রজ্জুর আশ্রয়ে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তোমার আশ্রয়েই এই মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তুমি জগৎরূপে পরিণত হও নাই। জগৎ কেবল তোমার এক অংশকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

দেবগণ সেই আদ্যাশক্তিকেই অন্যত্র স্তব করিতেছেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনে ত্যতিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যে দেবতা সকলভূতের মধ্যে চেতনা বলিয়া কথিত হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

ইহাতেও যদি হিন্দুর দুর্গাপূজা ব্রহ্মোপাসনা নহে বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে পাঠক একবার সেই পূজার মন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখুন।

যাঁহাদের সে বিষয়ে সুবিধা নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটী মহাস্নানের মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পুরোহিত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুর্গাদেবীর অভিষেক করেন,—

"দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥
মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং।
মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥
সারস্বতাদিতোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমাং।
বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়-কলসেন তু॥

যক্ষাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ-কলসেন তু॥
বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু-সুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥
হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদক-পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥
সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীং।
শক্রাদয়োঽভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত এব চ॥
বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গল-সংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥"

(হে জগন্মাতঃ! আমি আর তোমাকে কি দিয়া অভিষেক করিব?) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতাগণ মন্দাকিনী জলদ্বারা প্রথম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে সুরেশ্বরি! মরুৎগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া মেঘাম্বুপূর্ণ দ্বিতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন। হে সুরোত্তমে! বিদ্যাধরগণ সরস্বতী আদি নদীর পবিত্র জলপূর্ণ তৃতীয়কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন। যক্ষ ও লোকপালগণ সাগরোদক দ্বারা চতুর্থ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। নাগগণ পদ্মরেণুসুগন্ধি জল দ্বারা পঞ্চম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হিমালয়, হেমকূট, প্রভৃতি পর্ব্বত সকল নির্ঝরোদক দ্বারা ষষ্ঠ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। ইন্দ্রাদি দেবতাসকল ও সপ্তঋষি সর্ব্বতীর্থের জলদ্বারা সপ্তম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন্। বসুগণ অষ্টম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে অষ্টমঙ্গলদায়িনি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার।

এ মন্ত্র যিনি মনোযোগপূর্ব্বক একবার শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে কি কখনও এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, দুর্গাপূজা পরব্রহ্মের পূজা নহে ? এই মন্ত্র দ্বারা যে মহাভাব সূচিত হইয়াছে, নিরাকারবাদীর রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত দ্বারা তাহার ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায় ;—

"তোমার আরতি করে নিখিল ভুবন ;
নিরখি জুড়াই নাথ, যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন দীপ জ্বলে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন হৃদয়রঞ্জন ॥
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন :
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ !
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥"

(ঘ) সাকার উপাসকগণ আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক পদার্থ সকলের পূজা করেন বলিয়া নগেন্দ্র বাবু তাঁহাদের দোষ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে খুসি করা বড়ই মুস্কিলের কথা। হিন্দুগণ যখন কৃত্রিম পদার্থের (প্রতিমার) অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা করেন, তখন নগেন্দ্রবাবু বলেন,—স্বাভাবিক পদার্থের অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, প্রতিমা কল্পিত, মিথ্যা।

"সৃষ্ট পদার্থের অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এবং প্রতিমাঅবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কল্পনা ও সত্যে যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যে তত প্রভেদ। * * * * কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ

আছে বলিয়া জগৎ-কার্য্য অবলম্বনে জগদীশ্বরের পূজা যেমন স্বাভাবিক, একটা পুত্তলিকা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর পূজা কখনই সেরূপ নহে।" *

এস্থলে নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, স্বাভাবিক-পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা শ্রেষ্ঠ ও বিধেয়। কিন্তু আবার হিন্দুগণকে স্বাভাবিক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা করিতে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন,—"ছিছি! উহা পৌত্তলিকতা!"

"আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ানক, স্বাভাবিক পদার্থ সকলের পূজাও তাহার (পৌত্তলিকতার) অন্তর্গত।" নগেন্দ্র বাবু কি বলিতে চান, সাকার-উপাসকগণ সেই সকল পদার্থের পূজা করেন? সেই সকল পদার্থের অবলম্বনে ঈশ্বরকে পূজা না করিয়া, সেই সকল পদার্থকেই ঈশ্বরবোধে পূজা করেন? নগেন্দ্র বাবু এই ভ্রান্তবিশ্বাস কোথায় পাইলেন? তিনি বলেন,—

"তেজঃপুঞ্জ দিবাকর, সাকারবাদীর পূজনীয়। "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মিদিবাকরম্।" জবা কুসুমের ন্যায় বর্ণ, কশ্যপের পুত্র, মহাজ্যোতিবিশিষ্ট, অন্ধকার-বিনাশক, সকল পাপবিনাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি। সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাকারবাদী কেমন ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করেন।"

সূর্য্যের এই প্রণামমন্ত্রের মধ্যে নগেন্দ্র বাবু কোথায় পাইলেন যে, সাকারবাদী এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া জড়সূর্য্যমণ্ডলকে প্রণাম করেন? যে ঋষিগণ এই মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতই মূর্খ যে, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন জড় সূর্য্যপিণ্ড পাপ নাশ করিতে পারে ও কশ্যপমুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যের অধিষ্ঠিত-

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২১, ২২ পৃষ্ঠা।

দেবতাকেই প্রণাম করা হয়। যে মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের অর্ঘ্য দেওয়া হয়, সেখানে ইহা আরও স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

হে বিবস্বন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর তেজস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি জগৎ সৃজন করিয়াছ, তুমি শুদ্ধ, তুমি সবিতা, তুমি কর্ম্মদান কর।

পাঠক এস্থলে স্পষ্টই দেখিতেছেন, সূর্য্যদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানে ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাজ্ঞানে পূজা করা হইতেছে। এতদ্দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুউপাসক কখনও সূর্য্যকে জড়পিণ্ডজ্ঞানে পূজা করেন না। সূর্য্যের অধিষ্ঠিত দেবতাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করেন। হিন্দুর সূর্য্যোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা।

সূর্য্য সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অন্যান্য স্বাভাবিক পদার্থ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

কৃষ্ণনগরের নিকট দোগেছে গ্রামে একটা অদ্ভুত, বিশেষপ্রকারআকৃতি বিশিষ্ট শাল্মলীবৃক্ষ আছে। চতুঃপার্শ্বস্থ অবোধ গ্রামবাসিগণ উহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।"

অবোধ গ্রামবাসিগণ শাল্মলীবৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। নগেন্দ্র বাবু যদি একটু অনুসন্ধান করিতেন, তবে জানিতে পারিতেন, সেরূপ অবোধ লোক হিন্দুসমাজে কেহই নাই। অবশ্যই উক্ত শাল্মলী বৃক্ষ অবলম্বনে কোন দেবতার পূজা করা হয়। অন্ততঃ, যতস্থানে আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক পদার্থে পূজা করিবার কথা

আমরা জানি, সর্ব্বত্রই সেই সেই পদার্থ অবলম্বনে কোন দেবতার পূজা করা হয়। ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে মদাপুর গ্রামে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষে "রাজরাজেশ্বরের" পূজা হইয়া থাকে। উক্ত জেলায় কুশলনাথ নামক স্থানে একটী পুরাতন বৃক্ষে "কুশলনাথ" শিবের পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার অন্তর্গত খোড়দা মহকুমায় হটকেশ্বর নামক স্থানে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; সেই স্বভাবের অদ্ভুতপদার্থঅবলম্বনে "হটকেশ্বর মহাদেবের" পূজা হইয়া থাকে। উক্ত মহকুমার নিকট প্রসিদ্ধ বারুণীপর্ব্বতে একটী সুন্দর জলস্রোত (নির্ঝর) আছে। সেখানে "বারুণী" দেবতার পূজা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থলে বৃক্ষ, উষ্ণপ্রস্রবণ ও নির্ঝরের উপাসনা হয় না। সেই সেই জড়পদার্থ অবলম্বনে এক দেবতার পূজা হয়।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান বিনাশ করিতেছে। বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে গিয়া ছাত্র উপযুক্ত পরিমাণে হাইড্রোজিন ও অক্সিজিন একত্র করিলেন, অমনি জল উৎপন্ন হইল। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ছাত্র বুঝিতে পারিলেন যে জল মূলভূত নহে। কেবল তাহাই নহে; সেই সঙ্গে সঙ্গে জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণদেবতাও চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি নিজে জল সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার কি আর জলের কর্ত্তা বরুণ দেবতায় বিশ্বাস থাকা সম্ভব? বিশেষ পরিমাণে নাইট্রোজিন ও বিশেষ পরিমাণে অক্সিজিন্ একত্র করিলে বায়ুর উৎপত্তি হইল। অমনি পবনদেব চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। সূর্য্য যে জড়পিণ্ডমাত্র, বিশেষ কোন দেবতা নহে, বিজ্ঞান উহা প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্য কি কি পদার্থে নির্ম্মিত (Composition of the sun) পণ্ডিতেরা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতেছেন।"

এখানে নগেন্দ্র বাবু একটী [illegible] ন্যায় পতিত হইয়াছেন।

জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণদেবতা আর জল যে এক, বায়ুর অধিষ্ঠাতা পবনদেব আর বায়ু যে এক, কিংবা সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেব আর সূর্য্যমণ্ডল যে একই পদার্থ বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, নগেন্দ্র বাবু তাহা কোথায় পাইলেন ? জলের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব আর জল যদি একই পদার্থ হইত, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলের বিশ্লেষণ করিলে বরুণদেবেরও অস্তিত্ব নাশ হইত, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলের সৃষ্টি করিলে, বরুণ দেবকেও সৃষ্টি করা হইত। কিন্তু বরুণদেব আর জলকে কেহ এক বস্তু বলিয়া কখনও বিশ্বাস করে না। যদি বল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যদি জল বিনাশ করা যায়, তবে বরুণদেব থাকিবেন কোথায় ? তাহার উত্তর এই, পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি উড়াইয়া দিতে পারে বিজ্ঞানের কি এতদূর ক্ষমতা আছে ? বিজ্ঞানবলে সমুদ্রশোষণ হইতে পারে, ইহা অতি হাস্যকর কথা। দ্বিতীয়তঃ জড়-বিজ্ঞানই জ্ঞানের শেষ-সীমা নহে। জড়বিজ্ঞানের উপর আরও বিজ্ঞান আছে। তর্কের খাতিরে যেন মানিলাম, কোন বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিত কোন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র, নদ, নদী সকল শোষণ করিয়া ফেলিলেন ও বরুণদেবকে রাজ্যছাড়া করিলেন। কিন্তু এই স্থূল জলের উপর আবার সূক্ষ্ম জল আছে, স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উপর আবার সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) আছে। সাধ্য কি জড়বিজ্ঞান তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে ? ফলকথা এই, দুই পাতা বিজ্ঞান পড়িলে, সেই বিজ্ঞানজনিত গর্ব্বে স্ফীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যিনি বিজ্ঞান পাঠ শেষ করিয়াছেন, তিনি দেখেন সে বিজ্ঞানের উপর আরও বিজ্ঞান রহিয়াছে—তিনি বিজ্ঞান-সমুদ্রের তীরবর্ত্তী

উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। অল্পজ্ঞানীর নিকট সকলই জড়পদার্থ,জগতের যাহা কিছু সকলই তাঁহার Observation ও Experiment এর (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার)অন্তর্গত। মধ্যমজ্ঞানী দেখেন, এ জগতে কতক জড় ও কতক চৈতন্য—জড়ের সীমা, যেখানে শেষ হইয়াছে, চৈতন্যের সীমা সেখানে আরম্ভ হইয়াছে—কেবল জড়ের উপরই Observation ও Experiment খাটে, চৈতন্যপদার্থ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যিনি জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তিনি দেখিতে পারেন,—জড় আদৌ নাই, কেবল এক অখণ্ড, অনন্ত, চৈতন্যপদার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে; আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা কেবল আমাদের চক্ষুর দোষ, বুদ্ধির ভ্রম—তাঁহার নিকট এ বিশ্বজগৎ সকলই "একামেবাদ্বিতীয়ম্!"—এক অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ। তিনি দেখিতে পারেন,—

> অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

অর্থাৎ—"যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও আশ্রয় ভাবে বিদ্যমান আছেন।"

তিনি দেখিতে পারেন,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, অগ্নি এ সকল স্থূলভূতের কোনই সত্তা নাই—ইহারা সকলেই

এক অখণ্ড চৈতন্যপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু এরূপ দেখা জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় সম্ভব, তোমার আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা সেই অখণ্ড, অনন্ত চৈতন্যপদার্থ দেখিতে পারি না বলিয়া,তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে, অসীমকে সসীম ভাবে, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূতের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস করি। তাই সেই অনন্ত, অখণ্ড চৈতন্যপদার্থ আমাদের দৃষ্টিতে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ-রূপে, চন্দ্র দেব, সূর্য্যদেব, পবনদেব, বরুণদেব নামে পূজিত হন।

"বদ্ধ ও উদার।"

নগেন্দ্র বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"পৌত্তলিকের দেবতা কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে বদ্ধ। ব্রাহ্মের দেবতা পৃথিবীর সকল গ্রামে, সকল নগরে, কাশী, বৃন্দাবনের ন্যায় সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। পৌত্তলিকের দেবতা বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মের দেবতা সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মমন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।" *

একথাগুলি শুনিতে বেশ। কিন্তু ইহার কোন অর্থ আছে কি? "পৌত্তলিকের দেবতা কাশীবৃন্দাবন তীর্থে বদ্ধ"— ইহার অর্থ কি? নগেন্দ্র বাবু কি বলিতে চান, হিন্দুগণ কাশী-বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ঈশ্বরের পূজা করেন না বা করিতে পারেন না? প্রত্যহ হিন্দুগণ তিন বার ঈশ্বরোপাসনা করেন; নগেন্দ্র বাবু কি বলিতে চান, ইহার প্রত্যেক বারে তাঁহারা রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কাশী বৃন্দাবনে

---

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৫৪ পৃষ্ঠা।

গিয়া উপাসনা করিয়া আসেন? তাহা যদি না হইল, হিন্দুগণ নিজ২ ঘরে বসিয়া উপাসনা করেন ইহা যদি ঠিক হয়, তবে নগেন্দ্র বাবুর এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুগণ জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। নগেন্দ্র বাবুর কথার কোনই অর্থ নাই; ইহা চিন্তাশীল পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন।

আর একটী কথা। "ব্রাহ্মের দেবতা পৃথিবীর সকল গ্রামে, সকল নগরে, কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন।" একথা বলিতে বেশ, শুনিতেও ভাল। কিন্তু ইহার অর্থ কি কেহ কখনও হৃদয়ঙ্গম করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন? সাহস করিয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ ব্রাহ্মই ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করা কি এতই সোজা কথা? তাহা হইলে গীতায় একথা ভগবান্ বলিয়াছেন কেন যে, সর্ব্বত্রসমভাবে আমাকে দর্শন করিতে পারিলে মুক্তি-লাভ হয়? নিরাকারবাদিগণ কি সকলেই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন? বলিতে পারি না। ইহা তাঁহাদের আভ্যন্তরীন চরিত্রের কথা। কিন্তু আমরা বাহির হইতে যত দূর দেখিতে পারি, তাহাতে যেন সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না। যদি তাঁহারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে সমভাবে দর্শন করেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি হয় কেন, আত্মপরভাব আছে কেন, এক জনের সহিত অন্যের মতের মিল না হইলে তাঁহাকে নির্য্যাতন করা হয় কেন, সীমানা-সহরদ্দ লইয়া লাঠালাঠি হওয়ার উপক্রম হয় কেন? এ সকল কি সর্ব্বত্র সমদর্শনের ফল? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এই সাম্যের খেলা বুঝিতে পারি না।

আরও একটী কথা। "পৌত্তলিকদের দেবতা বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।" এ কথা কি হিন্দু অপেক্ষা ব্রাহ্ম উপাসকের প্রতি বেশী খাটে না? অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, তাঁহারা বাড়ীতে কোনও উপাসনা করেন না; তাঁহারা কেবল ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সহিত মিলিত ভাবে উপাসনা করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কি একথা খাটে না যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন?

"পরমেশ্বরকে অন্তরে পূজা করিতে চাই।"

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে পূজা করিতে চাই। তিনি অন্তরতম, প্রিয়তম, পুরুষ। অন্তরে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। পুত্তলিকা বাহিরে; বাহিরের জিনিষ বাহিরে থাকুক্। আমার ইষ্টদেবতা অন্তরে, তিনি অন্তরতম, প্রিয়তম। পুত্তলিকা বাহিরে, কতদূরে। প্রভু নিকটে রহিয়াছেন; প্রাণস্বরূপ প্রাণে রহিয়াছেন। বাহিরে জড়ের আশ্রয় লইতে যাইব কেন? যতদিন মনুষ্য মূর্ত্তিপূজা করে, ততদিন সে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না; বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে। মনুষ্য যখন আপনার অন্তরে প্রবেশ করে, সেখানে চৈতন্যস্বরূপ দেবতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়।" *

নগেন্দ্র বাবুর হিন্দুসমাজে প্রচলিত সাকারউপাসনার সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি এরূপ কথনও লিখিতে পারিতেন না। হিন্দুগণ কি ইষ্টদেবতাকে অন্তরে

* "সাকার নিরাকার উপাসনা"—৫৭ পৃষ্ঠা।

পূজা করেন না? তাঁহারা সর্ব্বদাই ত অন্তরে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তিনসন্ধ্যা ইষ্টদেবতার যে উপাসনা করেন, তাহা কি অন্তরের পূজা, না বাহিরের পূজা? কে কবে প্রতিমাদর্শনে নিত্যসন্ধ্যা ও পূজা করিয়া থাকে? আবার যখন প্রতিমা কিংবা বাহিরের কোন পদার্থ অবলম্বনে ইষ্ট-দেবতার পূজা করা হয়, তখন প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে হৃদয়-পদ্মে ধ্যান করিয়া "মানস-পূজা" করিতে হয়, ও তৎপরে বাহিরের পদার্থ অবলম্বনে তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নগেন্দ্র বাবু এ সকলের কোনই ধার ধারেন না, অথচ এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

আর একটী কথা। নগেন্দ্র বাবু এখানে বলেন,—

"বাহিরে জড়ের আশ্রয় লইতে যাইব কেন?"

তিনি আবার অন্যত্র ইহার বিপরীত বলিয়াছেন,—

"এই অত্যদ্ভুত, সুকৌশলময়, পরমসুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে।" *

এখন জিজ্ঞাস্য এই, জড়জগৎ কি বাহিরের জিনিষ নয়? জড়জগৎ কি আমাদের অন্তর হইতে দূরে নহে? তবে বাহিরের প্রতিমা সম্বন্ধে যে কথা খাটে, জড়জগৎ সম্বন্ধে সে কথা খাটিবে না কেন?

আরও একটী কথা। "জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে।" নগেন্দ্র বাবু যখন জড়জগৎ অবলম্বনে ঈশ্বরউপাসনা করেন, তখন এই প্রকাণ্ড জড়জগৎটা কি তাঁহার ভিতরে পুরিতে চাহেন?

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—১৫ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য তাহা কখনও পারিবেন না। এই জড়জগৎকে বাহিরে রাখিয়াই তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। জগৎ সম্বন্ধে যাহা খাটে, প্রতিমা সম্বন্ধেও তাহা খাটে। হিন্দু উপাসক কখনও প্রতিমাকে ভিতরে পূরিতে চান না, প্রতিমার অবলম্বনে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি অন্তরে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। পূজা বাহিরের ক্রিয়া নহে, মনের ক্রিয়া। তাহা বাহিরে হয় না, ভিতরে হয়। প্রতিমা কি জড়জগৎ সেই ভিতরের ক্রিয়া উদ্দীপিত করে।

পৌত্তলিকের কি মুক্তি নাই?

এই প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যারপরনাই উদারমত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। আমরা কখনও এরূপ বলি না, যে নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী সকলেই নরকগামী হইবে। মুক্তি কাহারও একচেটিয়া নহে। কর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই ফলাফল হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম, ও পবিত্রতা সেই পরিমাণেই তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর। * * * * *

কিন্তু একটী কথা বিশেষ করিয়া বলি। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই, সত্য ভিন্নও তেমন মুক্তি নাই। অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে? মুক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, অপ্রেম, অপবিত্রতা ও অসত্য এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে পৌত্তলিকতা লইয়া, মনুষ্য কেমন করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে। পাপাসক্তির শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই-

রূপ সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলেও মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" *

এই মত প্রমাণ করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"সাকারউপাসনা বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মূর্ত্তিপূজার অসারত্ব ও নিরাকার ব্রহ্মপূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদক শ্লোক শাস্ত্রে রাশি রাশি রহিয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই।" †

অতঃপর নগেন্দ্রবাবু কতকগুলি শ্লোক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার বিচার পরে করা যাইতেছে। প্রথম কথা এই,—সাকার উপাসকের মুক্তি নাই, কারণ নগেন্দ্র বাবু বলেন, "অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে?" ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ বোধ হয় এই, সাকারউপাসক অসত্য, কল্পিত প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বর পূজা করেন। সকলেই জানেন প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা কেবল কাম্য ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য। কোন হিন্দু তিনসন্ধ্যায় প্রতিমা অবলম্বনে নিত্য উপাসনা করেন না। কাম্য ক্রিয়া ইচ্ছাধীন (Optional) অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া গণ্য নহে। সুতরাং অসত্য প্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া উপাসনা হিন্দুগণের মধ্যে অতি অল্পলোকেই অল্প সময়ের জন্য করিয়া থাকেন। হিন্দুগণের প্রতিমা অবলম্বনের ন্যায় ব্রাহ্মগণ এই জড়জগৎ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন।

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা।

† ঐ—৫৮—৫৯ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, নিরাকার উপাসনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ অবলম্বন প্রয়োজনীয়। সুতরাং জড়-জগতের অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা নিরাকারবাদীর অবশ্যকর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া গণ্য। এই জড় জগৎ যে মিথ্যা, অসত্য তাহা নগেন্দ্র বাবু উৎকৃষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। * এখন কথা হইতেছে, নিরাকারবাদী যদি এই অসত্য জড়জগতের অবলম্বনে সর্ব্বদা ঈশ্বর উপাসনা করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তবে সাকারবাদী হিন্দু কখনও কোন সময়ে অসত্য জড়মূর্ত্তির অবলম্বনে ঈশ্বর-উপাসনা করিয়া মুক্তিপথের অধিকারী হইবেন না কেন? নগেন্দ্রবাবু কি বলিতে চান, কালীমূর্ত্তির উপাসক মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? কৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসক শ্রীগৌরাঙ্গ মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? মূর্ত্তি উপাসক শঙ্করাচার্য্য, রামপ্রসাদ—আর কত নাম করিব?—মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না?

"বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খলোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা;" নগেন্দ্র বাবু তাঁহার এই মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটার দ্বারাও কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না। তাঁহার উদ্ধৃত—

"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥"

* "পরমেশ্বর সার, সত্য, জগৎ অসার, অসত্য"—সাকার ও নিরাকার উপাসনা—১৮ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকের অর্থ ১৩৮ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন কুলার্ণবের—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিগু´ণস্যাশরীরিণঃ।
সাঁধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

এই শ্লোকের অর্থ "মূর্খদিগের চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে" ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখানে সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনার কথা বলা হইয়াছে; সাধক বলিতেই মূর্খ সাধক বুঝাইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। কি প্রকার সাধককে এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। ৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন। এতদ্ভিন্ন নগেন্দ্র বাবু আর যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয় না।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ লক্ষ শ্লোকের মধ্য হইতে বাছিয়া গুছিয়া সংগ্রহ করিয়া যে দশ বিশটী শ্লোক ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের পুঁজিপাটা (stock-in-trade) করিয়া রাখিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু সেই কয়েকটীর এখানে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কয়েকটী শ্লোক কোন ক্রমেই তাঁহাদের নব প্রচলিত মত সমর্থন করে না। এই কয়েকটী শ্লোককে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদক শ্লোক, (২) সাকার উপাসনা অপেক্ষা নির্গুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোক। প্রথম শ্রেণীর শ্লোক যথা,—

(ক) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইত্যাদি।

(খ) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

(গ) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমাভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

(ঘ) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণাবা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

(ঙ) অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং।
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

(চ) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

এ সকল শ্রুতির মধ্যে সাকার উপাসনার নাম গন্ধও নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা সাকার উপাসনার অসারত্ব কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইল ? এ সকল শ্রুতিতে অধ্যাত্মযোগ বা নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদন করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকারউপাসনার সহিত এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত নির্গুণোপাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। এ সকল শ্রুতিতে যাহা প্রতিপাদন করিতেছে, নিম্নলিখিত শ্লোক সকলও সেই একই কথা প্রতিপাদন করিতেছে,—

(ছ) একোব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৩য় অধ্যায়।

এতদ্দ্বারা আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ঙ) অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
নির্ম্মলং নিষ্কলং নিত্যং নিগুর্ণং ব্যোমসন্নিভম্।।

কুলার্ণব, তৃতীয় উল্লাস।

এ শ্লোক ও পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে।

(ঝ) পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।।

এ শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যমনিয়মাদির অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকগুলি এই,—

(ক) উপেক্ষ্যতৎতীর্থযাত্রাং জপহোমাদিকুর্ব্বতাং।
পিণ্ডংসমুৎসৃজ্যকরং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ।।

পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ।

(খ) অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।।

কুলার্ণব, ষষ্ঠ উল্লাস।

(গ) মনসাকল্পিতা মূর্ত্তির্নৃনাঞ্চেন্মোক্ষ-সাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(ঘ) সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ।।

(ঙ) কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্ত ন কিং কুরু।
নির্ব্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ।।

অষ্টাবক্রসংহিতা।

এই সকল শ্লোকের অর্থ বুঝিবার আগে একটা বিষয় স্মরণ

করা আবশ্যক। হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থ সকল যাঁহারা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কোন গ্রন্থকার যখন নিজের মত প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তিনি সেই মতের প্রশংসাসূচক কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার নিজের প্রতিপাদিত বিষয়ের প্রশংসা করিতে গিয়া এমনি কি সময় সময় অন্য প্রকার মতের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি যে প্রকার অধিকারী, তাহার জন্য সেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে যে শাস্ত্রের অধিকারী, সে ভিন্ন অন্যের সেই শাস্ত্র পড়িবার অধিকার নাই। যেমন অদ্বৈতবাদীর জন্য "পঞ্চদশী" কিংবা "অষ্টাবক্রসংহিতা" রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকার যাহাতে সেই অদ্বৈতাধিকারী অন্য শাস্ত্রপাঠে তাঁহার নির্দ্ধারিত পন্থা হইতে বিচলিত না হন, সেই জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন, এমন কি দ্বৈতবাদ ও সগুণ উপাসনার নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেইরূপ ভক্তিপ্রধান গ্রন্থে ভক্তিপন্থার যারপরনাই প্রশংসা করা হইয়াছে, জ্ঞানমার্গের নিন্দা করিতে গ্রন্থকার ত্রুটী করেন নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে সকলেই স্বীকার করিবেন, শাস্ত্রসকলের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই সকল স্তুতিনিন্দাসূচক শ্লোক সকলে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত নহে।

আর একটী কথা। "পঞ্চদশী" "অষ্টাবক্রসংহিতা", "কুলার্ণব" প্রভৃতি নির্গুণোপাসনা-প্রতিপাদক গ্রন্থ। যাঁহারা নির্গুণ উপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবার অধিকারী, তাঁহা-

দিগকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল গ্রন্থে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের নির্গুণ উপাসনার অধিকার জন্মে নাই, তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থের উপদেশ অনুসারে কাজ করিবার কোনই অধিকার নাই। "এম্-এ, পাশ না করিলে ভাল চাকরী পাইবে না, সুতরাং এম্-এ, পাশ কর" যদি কেহ এরূপ উপদেশ দেন, তবে বুঝিতে হইবে, এরূপ উপদেশ যাহারা প্রথমে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশ্য তাহাদের জন্য নহে। যাঁহারা বি-এ, পাশ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই এই উপদেশ প্রয়োজ্য। সেইরূপ—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিলে মুক্তি হয় না, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর" যদি এরূপ উপদেশ কোন পুস্তকে লেখা থাকে, তাহা কাহার প্রতি প্রয়োজ্য? তাহা কি সর্ব্বসাধারণের প্রতি প্রয়োজ্য? কখনই না। যে মহাত্মা বহুজীবন ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে এ উপদেশ খাটে। বলা বাহুল্য, পঞ্চদশী, কুলার্ণব, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, অষ্টাবক্রসংহিতার উদ্ধৃত শ্লোক সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের "অধিকারীর" জন্যই লেখা হইয়াছে, সে সকল কেবল সেই "অধিকারী" সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। এখন উক্ত শ্লোক সকলের বিচার করা যাউক।

(ক) "পরব্রহ্মের উপাসনাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রা, জপ, হোমাদি করিয়া থাকে, তাহার হস্তস্থিত খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিজহস্তকেই লেহন করে।" *

বলা বাহুল্য, এই শ্লোক দ্বারা পঞ্চদশীকার যাঁহারা নির্গুণ

* নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ

উপাসনার অধিকারী, কেবল তাঁহাদিগকেই তীর্থযাত্রা, জপ, হোমাদি দ্বারা বৃথা কালক্ষেপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের নির্গুণোপাসনার অধিকার নাই, তাঁহাদিগকে এ উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এটী পঞ্চদশী, "ধ্যানদীপের," ১৩০শ শ্লোক,—ইহার একটু উপরে পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—

"পামরাণাং ব্যবহৃতেঃ বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ
ততোঽপি সগুণোপাস্তি নির্গুণোপাসনং ততঃ
যাবদ্ বিজ্ঞান-সামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥ ১২১—২২।

অর্থাৎ পামরদিগের আচরণ অপেক্ষা কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, এবং সগুণোপাসনা অপেক্ষা নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। কারণ যতই উপাসনা প্রণালী ব্রহ্মজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার শ্রেষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। নির্গুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব নির্গুণোপাসনা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অধিকারীর অনুষ্ঠেয়, তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল। সুতরাং এখানে একথা লিখিয়া তাহার ৮ শ্লোক নীচে কখনও গ্রন্থকার নির্গুণোপাসনা সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদেশ দিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ সকল শ্লোক নির্গুণোপাসনার প্রশংসাসূচক।

(খ) এ শ্লোকের অর্থ—রূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া মনুষ্যেরা কর্ম্মকাণ্ডে রত হয়, আর পুণ্যবান্ মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ অমৃত ও আনন্দপরায়ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুলার্ণব নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদক গ্রন্থ; ইহাতে 'কর্ম্মকাণ্ডের' নিন্দা থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডাদি অনুষ্ঠান

কেবল চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতার জন্য অনুষ্ঠেয়, মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ (as means to an end) অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ে রত হন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে এই উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক এই—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"—সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কদাচ অহিতের জন্য নহে। এখন সাধকমাত্রেই সেই ব্রহ্মমূর্ত্তির উপাসনা করিতে গিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া পড়েন, আর অন্য লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান করেন,—নিষ্ফল কর্ম্মকাণ্ডে রত হওয়াই মূর্ত্তি পূজার অবশ্যম্ভাবী ফল—পরবর্ত্তী শ্লোকের যদি এরূপ অর্থ করা হয়, তবে ব্রহ্মের সেই রূপকল্পনা দ্বারা কি প্রকারে হিত সাধিত হইল? সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকের নগেন্দ্রবাবু যে অর্থ করিয়াছেন, পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত তাহার বিরোধ হয়। তৃতীয়তঃ, এ শ্লোকে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বলিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। যাহারা নিতান্ত "সুকৃতি" বলে ব্রহ্মজ্ঞান-সুধাপান করিবার "অধিকারী" হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসাধারণে কদাচ তাহা পারে না।

(গ) মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের অর্থ এই—"মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে মনুষ্যেরা স্বপ্নে লব্ধ রাজ্য দ্বারা অনায়াসে রাজা হইতে পারে।" নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ।

কুলার্ণবের স্থায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রও জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী। ইহাতে সাকারউপাসনা কেবল নির্গুণোপাসনার অধিকার লাভের জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্ম, আবশ্যকীয় এরূপ মত প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

"অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাং।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসঙ্কুলে॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্তু তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ।
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া।

অষ্টম উল্লাস, ২৮৫—২৮৭।

হে দেবি ! যে সকল মানব সর্ব্বদা কামাসক্ত, সুতরাং যোগমার্গের অধিকারী নহে, তাহাদের স্বভাবতঃ নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সে সকল কর্ম্ম (ধ্যান, অর্চ্চনা, জপ, সাধনাদি) যদি তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া ও আমার প্রতি অনুরক্তির সহিত সম্পন্ন করে, তাহাতেও তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইবে বলিয়া তাহারা জানুক। অতএব তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্ম আমি নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছি ও তাহাদের জন্ম আমার নানাবিধ রূপ ও নাম কল্পনা করিয়াছি।

অতএব দেখা গেল, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্ম সাকারউপাসনার আবশ্যকতা, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ম নহে। সাকারউপাসনা করিতে করিতে কামনানিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগমার্গের "অধিকারী" হওয়া যায়। মনঃকল্পিত রূপ ও নাম কেবল সেই চিত্তশুদ্ধির জন্মই প্রয়োজনীয়।

সেই রূপ ও নামের সাধনা অর্থাৎ সাকারউপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে। সেই রূপ ও নামের সাধনা দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না। যে গ্রন্থের এইরূপ মত তাহাতে সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে এরূপ মতের আশা করা অবৈধ। মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী বলিয়া এরূপ বলিতেছেন; কিন্তু যে সকল শাস্ত্র ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী তাহাতে সাকারউপাসনা দ্বারাই মোক্ষলাভ হইতে পারে এই মত প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতায় ভগবদুক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে, সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে। (দ্বাদশ অধ্যায় দেখ)। এই-রূপে আমরা দেখিলাম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী বলিয়া সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না বলিতেছেন; ইহা দ্বারা সাকারউপাসনার অসারতা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

এখানে আর একটী কথা উঠিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে চিত্ত-শুদ্ধির জন্য নাম ও রূপের সাহায্যে সাকারউপাসনার আব-শ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। নিরাকারবাদিগণ কি সকলেই চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সাকার উপাসনার কোনই আবশ্যকতা নাই?

(ঘ) ও (ঙ)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অষ্টাবক্রসংহিতা জ্ঞানমার্গ-প্রতিপাদক গ্রন্থ। সুতরাং তাহাতে জ্ঞানযোগেরই একমাত্র আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে ভক্তি-মার্গের সাকারউপাসনাপ্রতিপাদক মত আশা করা অবৈধ। আর একথাও অবশ্য স্মরণ করা উচিত, একমাত্র জ্ঞানমার্গের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—

"চেতনের মূর্ত্তিপরিজ্ঞানপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিও না।"

যাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহাদের জন্য এ উপদেশ নহে।

আর একটী কথা। "সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান কর, এই পরমতত্ত্বের উপদেশ দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে আর সম্ভব হয় না।" ইহার অর্থ কি এই হইতে পারে যে, সাকার উপাসনা মিথ্যা, অসার, অমূলক? সাকার জড়পদার্থকে মিথ্যা না বলিয়া কে সত্য বলিবে? আবার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও চৈতন্য, নিত্য ও অনিত্য, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না, নিরাকারবাদী মাত্রেই "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" লাভ করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্লোক ছাড়া নগেন্দ্রবাবু আরও দুইটী শ্লোক ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—

(১) যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেবজুহোতি সঃ॥

তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

(২) মৃচ্ছিলা-ধাতু-দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর-বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাংশান্তিং নযান্তিতে॥

তৃতীয়স্কন্ধ।

ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে মূল (context) দেখা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায়ে ভগবান্ অহৈতুকী ভক্তির সাধনপ্রণালী বর্ণনা করিতেছেন,—

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥
আধ্যাত্মিকানু-শ্রবণান্নাম-সঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়াতথা ॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাং ॥
যথা বাতরথোঘ্রাণ মাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধআশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনাং ॥
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেবজুহোতি সঃ ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈবতুষ্যেঽর্চ্চিতো ঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥

১৬—২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ আমার প্রতিমাদর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি, বন্দনা দ্বারা, অনাসক্তচিত্তে সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা দ্বারা, সাধুগণের সম্মান ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা দ্বারা, আত্মবৎ সর্ব্বভূতে মৈত্রী দ্বারা, যম ও নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা, আধ্যাত্মিকতত্ত্বশ্রবণ ও আমার নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা, সরলতা, সৎসঙ্গ, নিরহঙ্কার এই সকল গুণের দ্বারা মৎপরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই আমার গুণশ্রবণমাত্রে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন গন্ধ বায়ুর

সাহায্যে পুষ্প হইতে নাসিকাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ বিকার-রহিত যোগরত চিত্ত আমাতে প্রবিষ্ট হয়। (কিন্তু চিত্তশুদ্ধি কেবল প্রতিমাপূজা দ্বারা হয় না, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি আবশ্যক ; যাহারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি অভ্যাস না করিয়া কেবল প্রতিমা পূজা করে, ইহার পরের সাতটী শ্লোক দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে *)। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি, আমাকে সেই ভাবে না দেখিয়া মানবগণ প্রতিমাপূজার বিড়ম্বনা করে। যে আমাকে,—সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে, পরিত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ কেবল প্রতিমা-পূজা করে, সে ভস্মে হোম করে। যে ব্যক্তি পরশরীরমধ্যস্থ আমাকে হিংসা করে, যে অভিমানী, আত্মপরভেদদর্শী, অন্যান্য প্রাণীতে বৈরাচরণ করে, তাহার মন কখনও শান্তি পায় না। যাহারা সর্ব্ব প্রাণীকে অবমাননা করিয়া প্রচুর উপহার দ্বারাও আমাকে প্রতিমাতে অর্চ্চনা করে, আমি তাহাদের পূজাতে তুষ্ট হইনা। (তবে কি প্রতিমা পূজার কোন প্রয়োজন নাই ? † অবশ্য আছে।) যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, সে পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া অবকাশ মতে আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করিবে।

এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভাগবতের মতে,—

(ক) অহৈতুকী ভক্তি সাধনের পক্ষেও মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক।

* চিত্তশুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্ট্যৈব ভবতি ইতি বক্তুং, কেবল প্রতিমাদি-নিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি সপ্তভিঃ।"—শ্রীধরস্বামী।

† "তর্হি কিমর্চ্চাদৌ অর্চ্চনমনর্থকমেব নেত্যাহ।—শ্রীধরস্বামী।

(খ) যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সমদর্শন না জন্মে, সে পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা নিতান্ত আবশ্যক।

(গ) যাহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শন অভ্যাস ভুলিয়া কেবল মাত্র প্রতিমাপূজাতে চিত্ত অভিনিবেশ করে, তাহারা নিন্দনীয়।

নগেন্দ্রবাবু মূলের সহিত ঐক্য না করিয়া এই শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। কেবল মূর্খলোকদিগের চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য প্রতিমাপূজা, তাঁহার এ মত আদৌ ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং এমন কি যাঁহারা অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও প্রতিমাপূজা আবশ্যক, ইহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। আর যাঁহাদের মধ্যে আত্মপরবোধ আছে, পরস্পরের সহিত দলাদলি আছে, হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তাঁহাদেরও যে প্রতিমাপূজা একান্ত আবশ্যক, তাহা শেষের শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভাগবতকারের সাকার উপাসনা সম্বন্ধে মত বিশেষরূপে জানা গেল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকের মূলের সহিত ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক মনে করি।

এতদ্ভিন্ন ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক হইতে ২৫শ শ্লোক নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল শ্লোক দ্বারাও নগেন্দ্র বাবু পৌত্তলিকতার অসারত্ব এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলেও তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নগেন্দ্র

বাবু ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে সেই কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানপর, যজ্ঞশেষে সোমরসপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতিপবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্টদেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃব্রত ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূতসকলকে, এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

ইহার পর নগেন্দ্রবাবু বলেন, গীতার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গভোগ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।"

এ স্থলে প্রথম কথা এই, যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গভোগ হয় ও মুক্তিলাভ হয় না, সে কি যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনার দোষ, না যে ব্যক্তি সেই অস্থায়ী স্বর্গকামনা করিয়া দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞ করে তাহার দোষ? উপরের অনুবাদে স্পষ্টই আছে, "ত্রিবেদবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানপর যজ্ঞশেষে সোমরসপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোকলাভের

অভিলাষ করেন।" তাঁহারা স্বরলোক লাভের অভিলাষ করেন বলিয়াই তাঁহাদের স্বরলোকে গতি হইয়া পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে অধোগতি হয়। যদি তাঁহারা মোক্ষলাভ অভিলাষ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারিতেন। এই জন্য ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

এ শ্লোকের অর্থ, নগেন্দ্র বাবুর মতে, যাঁহারা আমাকে সকাম ভাবে ও নিষ্কামভাবে আরাধনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। স্বতরাং যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা যে মোক্ষ লাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা এই। গীতাদ্বারা দেবার্চ্চনাদির অসারত্তা প্রতিপাদন হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে সকলের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরের শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।"

যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত বস্তুসকল গ্রহণ করি।

নগেন্দ্র বাবু এ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলেন না কেন? ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে বলিয়া নয় কি?

ভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন,—

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞদান-তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥
গীতা ১৮।৫-৬।

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা উচিত নহে, সে সকল অনুষ্ঠান করাই উচিত। মনীষিগণ যজ্ঞদান তপস্যাদি কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হন। কিন্তু এ সকল কর্ম্ম অনাসক্ত চিত্তে ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠেয়। হে পার্থ! ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত বলিয়া জানিবে।

উল্লিখিত শ্লোক সকল ছাড়া নিরাকারবাদীর পুঁজীপাটায় আরও দুইটী শ্লোক আছে। নগেন্দ্রবাবু তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে ভুলিয়াছেন, কিন্তু আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি।

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥
শাতাতপসংহিতা।

মনুষ্যগণের দেবতা জলে, মনীষিগণের দেবতা স্বর্গে, মূর্খদিগের দেবতা কাষ্ঠ ও পাষাণে, যোগিগণের দেবতা আত্মাতে।

"অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্রবিদিতাত্মনাম্॥"
কুলার্ণব, নবম উল্লাস।

ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নিতে, মনীষিগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধিলোকের দেবতা প্রতিমাতে, আত্মবিদের দেবতা সর্ব্বত্র।

ইতিপূর্ব্বে সাকার উপাসনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, সাকারউপাসক এই দুই শ্লোকে বর্ণিত মূর্খ কিংবা অল্পবুদ্ধি নহেন। সাকার উপাসক মাত্রেই যেমন প্রতিমাতে কখন কখন দেবতার অধিষ্ঠান দেখিয়া পূজা করেন, তেমন সর্ব্বদা নিজহৃদয়েও দেবতাকে

ধ্যান করিয়া পূজা করেন। যে সকল মূর্খ লোক সাকার উপাসনার কোন ধার ধারে না, তাহাদিগকেই এই শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত পঞ্চদশীশ্লোকে তাহাদিগকে "পামর" বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সাকার উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে। নগেন্দ্র বাবু সাকার উপাসনার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদ্গীতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ হইতেছে। কি জ্ঞানযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি কর্ম্মযোগী, ইহারা সকলেই যে একমাত্র সাকার উপাসনা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টপথে অগ্রসর হইতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য হইতে যে দশ বিশটী শ্লোক এই মতের আপাততঃ বিরোধ-সূচক বলিয়া বোধ হয়, সে গুলির মূলের সহিত ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করাতে তদ্দ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হইতেছে। সুতরাং একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রদ্বারা সাকারউপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

সাকার উপাসনা কি চিরদিনই করিব?

আজকাল একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। সাকারউপাসনা দ্বারা নির্গুণোপাসনার (জ্ঞানমার্গের) অধিকার জন্মে,

একথা যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার কি কোন সীমা নাই? যে সকল ব্যক্তি আজীবন কেবল সাকারউপাসনা করিয়াই কাটাইলেন, তাঁহাদের জীবন যে বৃথা গেল।

যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা দুইটী ভুল করেন। প্রথমতঃ তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মত মনে করেন, পৃথিবীতে একবার জন্ম ও একবার মৃত্যু দ্বারাই বুঝি মানবজীবনের শেষ হইল। যখন একবার ভিন্ন জন্মগ্রহণ করিবার উপায় নাই, তখন যে রকমে হউক, এই জীবনেই সকল কাজ শেষ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে পাশ্চাত্যজগতে এই বিশ্বাস প্রচলিত, সেখানে এই এক জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথায় আমাদের কোন কাজ নাই। একবারের অধিক জন্ম নাই, ইহা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই, একবার জন্ম ও একবার মৃত্যু দ্বারা মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এজন্মে নিরাকার উপাসনা করা গেল না বলিয়া কাহারও ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। দ্বিতীয় কথা, যাঁহারা উক্তরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের আর একটী ভ্রমবিশ্বাস এই যে, মানুষ নিজে ইচ্ছা করিলেই বুঝি উপাসনার পথ নির্ব্বাচন করিতে পারে; কত দিন পর্য্যন্ত সাকারউপাসনা করিয়া পরে নির্গুণোপাসনার অধিকারী হইতে পারিবে, ইহা যেন সেই উপাসকের নিজের বিবেচনার অধীন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না। চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নির্গুণোপাসনার অধিকারী হইতে হইলে কতদূর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়, ইহা

তাঁহারা কিছুই জানেন না। কত কত জন্ম কঠোর তীব্র সাধনা দ্বারা মানুষ তাহার জীবভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লয়েরদিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা কেবল হিন্দু যোগী জানেন। সাকার উপাসনা হইতে নির্গুণোপাসনায় উন্নীত হওয়া আমরা ইচ্ছা করিলেই পারি না। তবে এক কথা এই, এজন্মে যতটুকু সাধনা দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, তাহা বিনষ্ট হইবে না, তাহা আত্মার গায়ে অক্ষয় অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিল, পর জন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না, এ জন্মে যতদূর উন্নতি হইয়াছে, ঐশ্বরিক চিরন্তন নিয়মবলে তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এইরূপে যখন নির্গুণোপাসনার জন্য চিত্তভূমি উপযুক্ত হইবে, তখন আপনা হইতেই বিষয়বাসনা সকল সমূলে বিনষ্ট হইবে, আপনা হইতেই সদ্‌গুরুর শুভসম্মিলন হইবে, আপনা হইতেই সাধনোপযোগী সুবিধা সকল সংঘটিত হইবে। তখন সাকার উপাসনা, সন্ধ্যাপূজা করিতে কোনই প্রবৃত্তি হইবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কে পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল? তাঁহার জীবনী লেখক বলেন,—

"তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "প্রসাদি ফুলে কি ক'রে পূজা করিব?" তদবধি পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, এ জীবনে নির্গুণোপাসনা করিতে পারিলাম না বলিয়া কাহারও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যখন যাঁহার চিত্তভূমি পরিষ্কৃত হইবে, তখন তাঁহাকে আপনা

হইতেই নির্গুণোপাসনা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, কৃত্রিম উপায়ে নির্গুণোপাসনার অধিকারী হওয়া যায় না।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসকগণ ত আজীবন এক ভাবেই সাকার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন— কিন্তু কৈ কাহারও ত কোন চিত্তের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ বিষয়াসক্ত, এখনও ত সেইরূপই আছেন। তাঁহাদের নৈতিক জীবন পূর্ব্বে যেরূপ মলিন ছিল, এখনও ত তাই আছে। তবে সাকার উপাসনা দ্বারা কি ফললাভ হইল? ইহার উত্তর এই, আজ কাল হিন্দুসমাজে অতি অল্প লোকেই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রকৃতরূপে সন্ধ্যাপূজাদি করিয়া থাকেন। ইহা সেই সকল উপাসকের দোষ, সাকার উপাসনার দোষ নহে।

পুরাণ সকলের বিদ্বেষ ভাব।

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদায় সকলের মধ্যে মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কেবল বিবিধ হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে, এমন নহে, শাস্ত্রেও ঐ মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়সকলের অবলম্বিত শাস্ত্রসকল পরস্পরের প্রতি সুতীক্ষ্ণবাণবর্ষণ করিতেছে। পরস্পরের ধর্ম্মমত ও উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্যখর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।"

ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাদের উপাস্যদেবতাকে অন্যান্য দেবতার সৃষ্টি-

কর্ত্তা বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বেষ-বুদ্ধি-মূলক নহে। তবে আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার গৌরবখর্ব্ব করিয়া তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার গৌরববর্দ্ধন করিতে যে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন জাতির অধোগতি হয়, তখন সেই অধোগতির ছায়া সেই জাতির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। যখন কালক্রমে হিন্দুসমাজের অধোগতি হইল, তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব সমাজের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ শাস্ত্রেও সেই বিদ্বেষভাবসূচক শ্লোক সকল রচনা করিয়া প্রক্ষেপকরিয়া (interpolate) দিল। আজকাল যেমন মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সংবাদপত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ভাব প্রচারিত হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে পুরাণ সকলের দ্বারা সেইরূপ হইত। তাহাতে যে উদ্দেশে ও যে ভাবে পুরাণ সকল প্রথমতঃ রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সকলশাস্ত্রের মূলে এক বেদ, এক শ্রুতি—এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে এই সকল বিদ্বেষদ্বারা মূল সিদ্ধান্তের কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।

উপসংহার।

নববিধান মতের আলোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান মতের প্রবর্ত্তক। নববিধানের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মমতের কিছু তারতম্য আছে। সুতরাং নববিধান মত কি, তাহা না দেখিলে এ পুস্তকে ব্রাহ্মমতের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেই নববিধান মত কি, তাহা একবার দেখা যাউক।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাদের অসারভাগ ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক এই নববিধান মত গঠিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহার সমবায়ে এই নূতন ধর্ম্ম প্রস্তুত হইয়াছে। নববিধানমতে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রতিমাপূজা ও সাকার উপাসনার অন্যান্য অংশ অসার, আর নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই এক মাত্র সার অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্য হইতেও কেবল ঈশ্বরোপাসনার ভাগ খাঁটী ও তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু, তাহা অসার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু সেই নিরাকার ঈশ্বরকে কি প্রণালীতে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে গিয়া, অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় ইহাঁরাও প্রটেষ্টাণ্ট্ খ্রীষ্টানদিগের (Protestant Churchএর) প্রণালী গ্রহণ করিতেছেন। মোটের উপর ধরিতে গেলে নববিধানের মতও বিলাতী Theism মতের রূপান্তর মাত্র।

সকল ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ, এই ধর্ম্মমত কেবল মত (in theory) বলিয়া ধরিলে, শুনিতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে (in practice) ইহার মূল্য কিছুই নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য নিহিত আছে, তাহা সাধকের জীবনে বিকাশ করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মের, সেই সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। সেই ধর্ম্মের যাহা অসার বলিয়া বোধ হয়, তাহা সার বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ এ সংসারে অসার কিছুই নাই; কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, কি প্রকৃতিতত্ত্ব যে দিকে তাকান যায়, সর্ব্বত্রই দেখা যায় অসারের মধ্য হইতে সার উৎপন্ন হইতেছে; অসার ভিন্ন সারের উৎপত্তি হইতে পারে না; অসার দ্বারা সার পরিরক্ষিত হইতেছে। সুতরাং যাহা আপাততঃ অসার বলিয়া বোধ হইতেছে, জ্ঞানের চক্ষে তাহাই সার।* ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে,

* মহাপণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার্ বলেন :—

There are three cardinal facts:—"The first is that with which we set out, namely, the existence of a fundamental verity under all forms of religion, however degraded. In each of them there is a soul of truth...The second of these cardinal facts set forth at length in the foregoing section is that while these concrete elements, in which each creed embodies this soul of truth, are as bad as measured by our absolute standard, they are good as measured by a relative standard. Though from higher perceptions they hide the abstract verity within them, yet to lower perceptions they render the verity more appreciable than it would otherwise be. They serve to make real and influential over men that which would else be unreal and uninfluential, or we *may call them protecting envelopes without which the contained truth would die. The*

ফুল দেখিতে সুন্দর। এখন সেই ফুল কি আকাশ হইতে পড়িয়াছে? না,সেই গাছের মূল গুঁড়িরূপে, গুঁড়ি ডালরূপে, ডাল শাখারূপে,শাখা পত্ররূপে,পত্র ফুলরূপে পরিণত হইয়াছে? সেই মূল, গুঁড়ি, ডাল, শাখা, পত্র আমাদের চিত্তআকর্ষণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু যে ফুলের সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত হইতেছি, সেই ফুল কোথা হইতে আসিল? এখন সেই গাছের মধ্যে ফুলই সার বস্তু, না মূল, গুঁড়ি, ডাল, শাখা, পত্র ইহারা সকলেই সারবস্তু? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি হয়, হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সার সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কি আকাশ হইতে আসে? না, বহুজীবনব্যাপী, বহুজন্মব্যাপী সাকার সাধনা দ্বারা হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এইরূপ। মূলকে ফুলে পরিণত হইতে হইলে তাহাকে কোন বিশেষ শাখার, বিশেষ প্রশাখার মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইতে হইবে। সেইরূপ মোক্ষার্থীকে প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্ম্মের, বিশেষ সম্প্রদায়ের আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

---

remaining cardinal fact is that these various beliefs are parts of the constituted order of things; and not accidental, but parts. Seeing how one or other of them is everywhere present, is of perennial growth; and when cut down, redevelopes in a form slightly modified; we cannot avoid the inference *that they are needful accompaniments of human life,* severally fitted to the Societies in which they are indigenous.—" First Principles, pp. 121—122. (The Italics are ours).

অতএব আমরা দেখিলাম, হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, কোন ধর্ম্মের কিছুই অসার নহে, কোন ধর্ম্মের মধ্য হইতেই কিছু অসার বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। "When cut down, redevelopes in a form slightly modified."—নিরাকারবাদীর গানে ও বক্তৃতায় নিরাকার ব্রহ্মের যে হস্তপদ ও মুখ কল্পিত হয়, তাহার কারণ এই নহে কি?

নববিধান মত যে কার্য্যক্ষেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা সহজে দেখা যাইতেছে। এই মতের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের জীবনকালে, কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-জীবনের জন্য এই মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে ১০।১২ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই নববিধানের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। মহাজনগণ বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে নদীর গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোন নদী সোজা চলিতেছে, কোন নদী বাঁকা চলিতেছে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে, ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া, সকল নদীই এক সমুদ্রে পতিত হইতেছে। এখন যদি কোন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, সকল নদীই এক পথে চলিবে; তিনি যদি গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, সিন্ধু প্রভৃতি সকল নদীর জল প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটা নূতন খাত কাটিয়া দেন, তাহার ফল কি হইবে? প্রাকৃতিক নিয়মের বলে সে খাত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সকল নদীই নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হইবে। কাহার সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে? তুমি ফুলের বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন গাছে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফুটিয়া বাগান উজ্জ্বল করিয়াছে। তুমি মনে করিলে, এই সকল ফুল যদি ভিন্ন ভিন্ন গাছে না ফুটিয়া কেবল এক গাছে ফুটিত, তাহা হইলে আরও কত শোভা হইত! তোমার মনে যখনি এই ভাব হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিলে। তুমি একটী বটগাছ সেই বাগানের মধ্যস্থানে রোপণ করিয়া গোলাপ, মল্লিকা, বেল, যুঁই, কামিনী, চাঁপা, চামেলী, গন্ধরাজ, জবা প্রভৃতি যেখানে যে গাছে যে ফুল

ছিল, সে সকল তুলিয়া আনিয়া বটগাছের ডালে ডালে গুঁজিয়া দিলে,—সে বটগাছের শোভা আর ধরে না! কিন্তু হায়! পরদিন প্রভাতে আসিয়া তুমি দেখিলে, যেমন বটগাছ তেমন বটগাছই পড়িয়া আছে, সে শোভা আর নাই, সে সকল ফুল শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই ভিন্ন ভিন্ন গাছে আবার নূতন ফুল ফুটিয়াছে। তোমার সকল ফুলগাছকে এক করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইল। এই ফুলগাছ সম্বন্ধে যাহা ঘটিল, আজ নববিধান সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। কার সাধ্য প্রকৃতির নিয়মের অন্যথা করিতে পারে? বৈষম্য সৃষ্টির অবস্থা, সাম্য লয়ের অবস্থা—ইহাই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম।

ব্রাহ্ম-সমাজের স্থায়িত্ব।

এ সংসারে যাহা সত্য, তাহাই স্থায়ী হয়; আর যাহা অসত্য, ভ্রান্তিমূলক, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইতে হইয়াছে, শ্রুতির ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যার উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। তবে তাহা এতদিন স্থায়ী হইল কি প্রকারে? স্বভাবতঃ সকলের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এত দিন স্থায়ী হওয়ার কারণ আছে। মুখে ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন বলিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা "অবিধিপূর্ব্বক" সাকার উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা বারংবার দেখিয়াছি, ব্রহ্মে নাম, রূপ ও গুণ আরোপনা করিয়া কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া যে উপাসনা,

তাহাই শাস্ত্রমতে নিরাকার উপাসনা। ব্রাহ্মগণ মুখে নিরাকার উপাসনা করেন বলিলেও, তাঁহারা প্রকৃতরূপে সাকার উপাসনাই করিতেছেন। তাঁহাদের নিরাকার (?) ব্রহ্ম সগুণ, তিনি দয়াময়, তিনি প্রেমময়, তিনি মঙ্গলময়, তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার নামও আছে—এই সকলই তাঁহার নাম। গুণ ও নাম থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপও আসে। কিন্তু যখন প্রথমেই তাঁহারা ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া ফেলিয়াছেন, তখন স্পষ্টতঃ অর্থাৎ বাক্যে ও উপদেশে তাঁহারা রূপ স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা না পারিলেও প্রকারান্তরে তাঁহারা ব্রহ্মের রূপ, আকৃতি সকলই স্বীকার করিতেছেন। কোন মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের রূপ না দেখিলেও, "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে, ভক্ত জনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে,'' ও জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে, পত্র, পুষ্প, বৃক্ষে, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্রে, ব্রহ্মের রূপ দেখিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথবসু লিখিয়াছেন।—

"খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট সীমা সহরদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হৃদয়স্থিত অনন্তের আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া রাখে বলিয়া, এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাসা মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাহ্য পদার্থে, সমুদ্রে, সরোবরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, গাছে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে ঈশ্বর খুঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পূজা করেন।" হিন্দুত্ব—২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধেও ঠিক একথা খাটে। ইঁহারা শ্বরের বিশেষ বিশেষ আকৃতি বা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উপাসনা করিতে না পারিয়া জড়জগতে তাঁহার অনন্ত রূপ কল্পনা

করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সঙ্গীত-গুলি অতি উৎকৃষ্ট, অতি মনোরম। এমন কি আজকাল ব্রাহ্মসঙ্গীতেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবিত রাখিয়াছে। আমরা দূর হইতে শুনিতে পাই, এখন ব্রাহ্ম সমাজে কেবল সঙ্গীত শুনিবার জন্যই অনেক লোক যাতায়াত করেন। যখন সঙ্গীত শেষ হয়, তখনই অধিকাংশ লোক উঠিয়া আসেন। সেই সঙ্গীতগুলি এত মনোরম হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে ঈশ্বরের রূপ-বর্ণনা আছে। সঙ্গীতগ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে জানা যায়, জড় জগতের সৌন্দর্য্য ও তাহাতে ঈশ্বরের লীলা-বর্ণনায় উহা পরিপূর্ণ। অনেক গুলি সঙ্গীতে ঈশ্বরের হস্ত, পদ, মুখ কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃই রূপের মোহে মুগ্ধ, রূপের সহিত মিলিতভাবে ঈশ্বরের লীলা কীর্ত্তন করা হয় বলিয়া ব্রাহ্মসঙ্গীত এত মনো-রম। এখন নিরাকারবাদীর এই রূপ-দর্শন-লিপ্সা কোন স্থায়ী, স্থির কেন্দ্রবর্ত্তী মূর্ত্তি বিশেষে আকৃষ্ট হইতে না পারায়, কেবল জড়জগতের উপর পর্য্যবসিত হইতেছে। নিরাকারবাদীর সাধা-রণতঃ ঈশ্বরোপাসনাবিষয়ে যেরূপ অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্যম ও জীবন্ত স্বার্থত্যাগ, তাহা যদি এইরূপে বিনষ্ট না হইয়া কোন বিশেষ ঈশ্বরমূর্ত্তি অবলম্বনে প্রকৃতভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত, তবে আমাদের বোধ হয়, গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেক রামকৃষ্ণপরমহংস, অনেক রামপ্রসাদ হইতে পারিতেন।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণ যাহাই মনে করুন, এ দেশের চির-প্রচলিত সাধনপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাঁহাদের মনঃকল্পিত নূতন পথ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এক গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে

লইয়াছেন। "অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী, প্রকৃতি-দর্শী-" নিষ্কাম ঋষিগণ যে সাধন পথের প্রবর্ত্তক, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা অভ্রান্তরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে পথ অবলম্বন করিয়া কত কত সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যে পথ আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজ্য মহাপুরুষের দ্বারা অশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই চিরপ্রচলিত সাধন-পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মনঃকল্পিত নূতনপথ গ্রহণ করিয়া ও সর্ব্বসাধারণকে সেই পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ যে ভয়ানক দায়িত্ব স্বশিরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে শরীর সিহরিয়া উঠে!

ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা হিন্দুসমাজের উপকার।

ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া আর একটী কথা আসিল। এ সংসারে যাহা অসত্য, তাহা যেমন স্থায়ী হয় না; যাহার কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহাও কখন সৃষ্ট হয় না। যখন সামান্য বালুকাকণার মূলে পরমেশ্বরের মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তখন এই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তির মূলে কি কোনই মহান্ উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই আছে। যে সময়ে এদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, অবাধমুদ্রাযন্ত্রণের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার, ও শাস্ত্রাচার্য্যগণের উপদেশ দ্বারা

অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এ সকলের কিছুই ছিল না। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোকেই হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল অন্ধবিশ্বাসের সহিত আচার অনুষ্ঠান রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময়ে খ্রীষ্টান্ মিশনারিদিগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের পাশ্চাত্য-সভ্যতার চাক্‌চিক্য ও পাশ্চাত্য-দর্শন-বিজ্ঞান দ্বারা এদেশে এক নূতন আলোকশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আসিলে যেমন চক্ষে ধাঁদা লাগে, সেইরূপ তখন অনেকের চক্ষে পাশ্চাত্য আলোকের ধাঁদা লাগিয়াছিল। তাহার ফলে এ দেশের অনেকানেক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশের এই দুরবস্থা দর্শনে স্বদেশপ্রাণ মহাত্মারাজারামমোহনরায়ের মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। সেই খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে দেশের প্রচলিত সাকার উপাসনা ও পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্ম্ম এই উভয়ের একতাসাধন (Compromise)করিয়া এই নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। হিন্দুগণের প্রতিমা পূজাই মিসনরিগণের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্যস্থল ; এই ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহা রহিত করা হইল। তখন যে সকল হিন্দুর মন খ্রীষ্টানদিগের উপদেশে বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রতিমাপূজা না থাকাতে নিরাপত্তিতে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রবাহ এদেশে এক প্রবল বাধা পাইল। কে বলিতে পারে, যে সময়ে এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত না হইলে, অধিকাংশ হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টানসমাজে পরিণত

হইত না? হিন্দুসমাজকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সাধুপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার দ্বারা এই ভগবদিচ্ছা সংসাধিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। বিশেষতঃ মহাত্মারাজা রামমোহনরায়ের ঋণ হিন্দুসমাজ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।

হিন্দুসমাজ কি সেই ঋণ শোধ করিতে যত্নবান্ হইবেন না? যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, সে সময় এখন আর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এখন আর নাই। পূর্ব্বে যেরূপ অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন; এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের শরীর এখন বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, ভগবানের যে ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়াছে। এখন এদেশে আর ব্রাহ্মসমাজের কোন আবশ্যকতা নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মকে দূরে রাখা ব্রাহ্মধর্ম্মের যেরূপ এক মহান্ উদ্দেশ্য ছিল, আবার হিন্দুসমাজের মধ্যে শাস্ত্র-

শিক্ষা ও উপদেশ প্রবর্ত্তনের দ্বারা সমাজসংস্কার করাও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যে পুনরুত্থান-প্রবাহ, গত ১০। ১৫ বৎসর হইল, হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত-প্রবাহ দ্বারা হিন্দুসমাজের মধ্যে শক্তি-সঞ্চয়ের (Conservation of energy) ফল। ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন না হইলে কখনও এই পুনরুত্থান-প্রবাহ প্রচলিত হইয়া হিন্দু-সমাজে শাস্ত্রশিক্ষা ও পূর্ব্বসঞ্চিত আবর্জ্জনা-সংস্কারের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইত না। এখন ক্রমে সেই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রচারিত সমাজসংস্কারের যে সকল সূত্র হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় গৃহীত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের আর পৃথক্ অস্তিত্ব অনা-বশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশা করা যায়, কালে ব্রাহ্ম-সমাজ যে হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইয়াছিল, আবার সেই হিন্দুসমাজের সহিত মিলিয়া যাইবে। বোধ হয়, দেশের প্রত্যেক মঙ্গলার্থী ব্যক্তিই আমাদের এই আশা সফল হইতে দেখিলে আহ্লাদিত হইবেন। এখন ব্রাহ্মসমাজের ঋণ পরিশোধ করি-বার জন্য হিন্দুসমাজের এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্ম ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও হিন্দু-সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, হিন্দু সমাজের তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা একান্ত উচিত। আমাদের বোধ হয়, অনেক স্থলে গ্রহণ করাও হইতেছে। দেশের অধ্যাপক মণ্ড-লীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে কোন বৃথা আপত্তি উত্থাপন না করেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণের নিকট কর-

যোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন কেবল মতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, কিংবা পৌত্তলিকতা-অপবাদের ভয়ে প্রকৃত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে ক্রটী না করেন। মানুষের ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক, আত্মহিতেচ্ছু মহাত্মাগণ সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিলেই তাহা সংশোধন করিতে যত্নশীল হন। সুসভ্য পাশ্চাত্যগণ আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে ভয় কি, লজ্জা কি? ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রচলিত ব্রাহ্ম-উপাসনা যদি একাগ্রতা লাভের জন্য মানসিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহার পরিণাম পৌত্তলিকতা। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন, জগতে যে কিছু ধর্ম্ম আছে, তাহার কোনটাই প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে পৌত্তলিকতা অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের এই পৌত্তলিকতা অপবাদ আধুনিক সভ্যতার চক্ষে নিন্দনীয় হইলেও, তাহা আমাদের দোষ নহে, একটী বিশেষ গুণ। এমন কি, স্বামী স্ত্রীর প্রেম, কিংবা পিতামাতার প্রতি ভালবাসাও যদি সাধারণের অনুষ্ঠিত ও অনুমোদিত সীমানা অতিক্রম করে, তাহাও সুসভ্য জগতে এই পৌত্তলিকতার (idolatoryর) মধ্যে গণ্য। ইংরেজী অভিধানে idolatoryর একটী অর্থ Excessive love (অতিরিক্ত ভালবাসা) সুতরাং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর উপাসনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইলে এই পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের এই পৌত্তলিকতা অপবাদ অঙ্গের ভুষণ হউক! হে ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ! আসুন আমরা সকলে একমনে একপ্রাণে এই পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করি!! ইহাই সাধনা, ইহাতেই পরমগতি, ইহাতেই মুক্তি।

সম্পূর্ণ।

সংশুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৫	স্যাদবুদ্ধিঃ	সাদ্‌বুদ্ধিঃ
৯	১৬	রজোহংশৈঃ	রজোহংংশৈঃ
৯	২৩	স্বাত্বিক	সাত্ত্বিক
১০	৩	নিশ্চয়াত্বিকা	নিশ্চয়াত্মিকা
১০	৫	তাহা পাঁচটী	তাহারা পাঁচটী
১৩	১১	বহির্জ্জগৎই	বহির্জ্জগৎও
১৩	২১	সত্তাকে	সত্তা কে
২০	১২	এ মনুষ্য শস্থলে রীর	এস্থলে মনুষ্য শরীর
৪৫	১।২	আবশ্যক	আবশ্যকতা
৮১	১৯	দেখিতে যাই,	দেখিতে যাই।
৮৯	১০	কল্পিতরূপে অর্থাৎ প্রতিমায়	কল্পিত রূপের অর্থাৎ প্রতিমার
১০৭	৮	হিরণ্যময়	হিরন্ময়
১১৭	১৯	উৎন্ন	উৎপন্ন
১১৯	২১	বাবু রাজনারায়ণ বাবু	বাবু রাজ নারায়ণ বসু
১২০	৩	তোমায় মায়া	তোমার মায়া
১৩১	৯	গাণপত	গাণপত্য
১৩২	২১	উপাস্য ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত	উপাস্য বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
১৬২	৯	বিনসয়ম্পন্নে	বিনয়-সম্পন্নে
১৭৪	৫	ভাব ব্যতীত	মানবীয় ভাব ব্যতীত
১৯২	২৪	মাদকতার	মাদকতায়
১৯৯	৩	বিরহে অধীর	বিরহে কাতর
২০২	২০	সমস্তে উপনীত	অনন্তে উপনীত